মতামত ও লেখা পাঠানো সহ
সমস্ত ধরণের যোগাযোগ:
সম্পাদক
শ্রমিক শ্রেণীর মুখপত্র
শ্রমিকশক্তি
১১, আমহার্স্ট স্ট্রীট, কলকাতা-৯
ফোন : ৯৪৩৩২৪২৪৯৮
(বৃহস্পতিবার, ১১-২ টা)
shramikshakti@gmail.com

শ্রমিক শ্রেণীর মুখপত্র

শ্রমিকশক্তি

ভিতরের পাতায়

- ওয়ালমার্ট: শ্রমিকদের বঞ্চনা
- ঐতিহাসিক খাদ্য আন্দোলন
- টাটাকাহিনী
- 'বাম' সরকারের জেলে ৭৭ দিন
- পেপসির শ্রমিকরা ধর্মঘটে
- ডাও কেমিক্যালস্ বিরোধী সংগ্রাম
- ভারত-মার্কিন পরমানু চুক্তি

৬ষ্ঠ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা | সেপ্টেম্বর ২০০৮ | বিনিময়: ২ টাকা

বিশ্বব্যাঙ্কের রিপোর্ট

বিশ্বের এক-তৃতীয়াংশ দরিদ্র মানুষই ভারতবাসী

বিশেষ প্রতিবেদন: ভারতবর্ষে বাস করেন পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ গরীব মানুষ। দারিদ্রসীমার নতুন মানদন্ড হিসেবে দিনপ্রতি ১ মার্কিন ডলারের পরিবর্তে ১.২৫ মার্কিন ডলার (মোটামুটি ৫৫ টাকা) আয় ধরে এই হিসেব পাওয়া গেছে। দারিদ্র সীমার ঠিক ওপরে রয়েছেন বহু মানুষ, যার সংখ্যাটা সাব-সাহারান আফ্রিকার দেশগুলোর থেকে ঢের বেশী। দিনপ্রতি দুই ডলারের কম আয় করেন এমন মানুষের সংখ্যা ভারতবর্ষে ৮২.৮ কোটি, যা জনসংখ্যার ৭৫.৬ শতাংশ, যেখানে সাব-সাহারান আফ্রিকার দেশগুলোর (যে অঞ্চলকে বিশ্বের দরিদ্রতম অঞ্চল বলে ধরা হয়) ক্ষেত্রে এই হিসেবটা ৭২.২ শতাংশ। হিসেবটা বিশ্বব্যাঙ্কের 'আন্তর্জাতিক তুলনামূলক কর্মসূচী'র রিপোর্ট, যা প্রকাশিত হয়েছে গত ২৬শে আগস্ট। এই হিসেব অনুযায়ী ভারতবর্ষে দরিদ্র মানুষের সংখ্যাটা প্রায় ৪৫.৬ কোটি, যা দেশের জনসংখ্যার হিসেবের অর্ধেকের কাছাকাছি। পৃথিবীর দরিদ্রতম দেশগুলোর দারিদ্রসীমার হিসেব অনুযায়ী ধরলে ভারতে প্রতি দশ জনে চার জন ঐ দারিদ্রসীমার নীচে আছেন।

হিসেবটা শুধু ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে এরকম, তা নয়। বিশ্বের তথাকথিত উন্নয়নশীল দেশগুলোর ক্ষেত্রেই একই চিত্র—যতটা দারিদ্রমোচন হয়েছিল বলে অনুমান করা হয়েছিল, হিসেব দেখাচ্ছে যে বাস্তবে তা মোটেই হয়নি। পূর্ব ইউরোপ ও মধ্য এশিয়ার দেশগুলোর ক্ষেত্রে এই দারিদ্রের হার বিগত বছরগুলোতে মারাত্মকভাবে বেড়েছে বলে এই হিসেব বলছে। এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কের অন্য একটি রিপোর্ট অনুযায়ী দারিদ্রের নিরিখে এশীয় দেশগুলোর মধ্যে ভারত পিছিয়ে রয়েছে বাংলাদেশ, পাকিস্তান কিংবা শ্রীলঙ্কার চেয়েও।

ধর্মঘট সংগঠিত করার 'অপরাধে'
নজিরবিহীন মালিকী হামলা হিন্দুস্তান মোটরসে

বরখাস্ত ২২ জন শ্রমিকনেতা

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত বছর যে সময়ে নন্দীগ্রাম গণহত্যা নিয়ে সারা পশ্চিমবঙ্গ আলোড়িত, তখনই হিন্দুস্তান মোটরস কারখানার শ্রমিকরা এক ঐতিহাসিক লড়াই লড়েছিলেন। ১৩ই মার্চ ২০০৭ থেকে শুরু করে ৬১ দিন ধর্মঘট পালন করেছিলেন শ্রমিকরা, তাদের ৬ বছরের বকেয়া ডি.এ, বেতন নিয়মিতকরণ, বদলী ও ঠিকা শ্রমিকদের কাজে পুনর্বহাল প্রভৃতি দাবীতে। সেই লড়াই আংশিকভাবে জয়যুক্ত হয়। কিন্তু মালিক বিড়লারা কারখানার লড়াকু ইউনিয়ন সংগ্রামী শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন (এস এস কে ইউ)-এর বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হয়ে ওঠে, কারণ তারাই এই লড়াইকে নেতৃত্ব দিয়েছিল। এস এস কে ইউ-র ৫০ জনেরও বেশী কর্মী ও নেতার বিরুদ্ধে চার্জশীট আনে তারা, অনেককেই সাসপেনশনের শাস্তি পোয়াতে হয়। টার্মিনেশন হয়েছে যাদের, তাদের অধিকাংশই সংগ্রামী শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নেরপদাধিকারী।

তারপর শুরু হয় ডোমেস্টিক এনকোয়্যারি, এবং এক-দেড় বছর ধরে চলা এনকোয়্যারির ফলাফল যা হওয়ার তাই হল, মালিকপক্ষ তার পেটোয়া লোকদের দিয়ে বিচার করিয়ে এই লড়াকু শ্রমিকদের দোষী সাব্যস্ত করলো, শুরু হল তাদের শাস্তির প্রক্রিয়া। ১৩ই আগস্ট থেকে কারখানায় একের পর এক বহিষ্কারের ঢল নামলো। ২৯ শে আগস্ট পর্যন্ত এই সংখ্যাটা দাঁড়িয়ে আছে ২২ জনে। এরকম আক্রমণ ভারতে নজিরবিহীন, পশ্চিমবঙ্গে তো বটেই।

মালিকপক্ষের উদ্দেশ্যটা স্পষ্ট। লড়াকু ইউনিয়ন এস এস কে ইউ কে ধ্বংস করতে হবে। না হলে শ্রমিকদের ওপর অবিরাম, দুঃসহ অত্যাচার নামানোটা তাদের পক্ষে অসম্ভব। মালিকপক্ষকে মদত করতে সাথে আছে সিআইটিইউ এবং সিপিএম ও রাজ্য সরকার।

আশ্চর্যের ব্যাপার হল, যাদেরকেই বরখাস্ত করা হচ্ছে, তাদেরই একই সঙ্গে ম্যানেজমেন্টের তরফে ভি আর এস-এর প্রস্তাবও দেওয়া হচ্ছে। মোটের ওপর ভি আর এস-এর স্কীম আবার নামানো এবং শ্রমিকদের মধ্যে ভীতির সৃষ্টি করা যে প্রতিবাদ করলে তার মাসুল এভাবে দিতে হবে—এই দুই উদ্দেশ্য নিয়ে মালিকপক্ষ এই ভয়ানক আক্রমণ শুরু করেছে। কিন্তু

শেষাংশ ৭ পৃষ্ঠায়

বাউড়িয়া কটন

কলকাতায় শ্রমিক বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি: দীর্ঘ ১৪ বছর বন্ধ থাকার পরও নিজেদের দাবি-দাওয়া নিয়ে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে বাউড়িয়া কটন মিলের শ্রমিকরা। গত ১১ আগস্ট পি.এফ. সংক্রান্ত দাবি নিয়ে বাউড়িয়া কটন সংগ্রামী শ্রমিক ইউনিয়নের নেতৃত্বে শ্রমিকদের মিছিল ও সমাবেশ হয় কলকাতার ধর্মতলা অঞ্চলে।

১৯৯৫ সালে বাউড়িয়া কটন মিল বন্ধ হয়ে গেলে এই কারখানায় বাউড়িয়া কটন সংগ্রামী শ্রমিক ইউনিয়ন। মিল খোলা ও অন্যান্য দাবির পাশাপাশি শ্রমিকদের প্রভিডেন্ট ফাণ্ডে পড়ে থাকা কোটি কোটি টাকা উদ্ধার করার কাজটি এই

শেষাংশ ৫ পৃষ্ঠায়

টিটাগড় মাঠকল

শ্রমিকদের ৭২ ঘন্টা অনশন

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত ১৫ই মে উত্তর ২৪ পরগণার লুমটেক্স (মাঠকল)-এ ম্যানেজার খুনের ঘটনার জন্য সংগ্রামী মজদুর ইউনিয়নের শ্রমিকদের ওপর মিথ্যে অভিযোগ চাপিয়ে ২১ জন শ্রমিক ও শ্রমিকনেতাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। প্রায় তিনমাস পরে তারা মুক্তি পান। ঐ ১৫ই মে থেকেই এই ঘটনার জের টেনে মিল বন্ধ করে রেখে দেয় মালিক-ম্যানেজমেন্ট। একদিকে কারখানা খোলার দাবীতে এবং অন্যদিকে লড়াকু সাথীদের জেল থেকে মুক্ত করার লড়াই করতে করতে শ্রমিকদের মধ্যে ঐক্য আরও জোরালো হয়েছে।

শেষাংশ ৫ পৃষ্ঠায়

লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধি, কালা পরমাণু চুক্তি, খুচরো ব্যবসায় বৃহৎ পুঁজির অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে

মজদুর ক্রান্তি পরিষদের গণ আইন অমান্য

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২৬ শে আগস্ট কলকাতায় মজদুর ক্রান্তি পরিষদের পক্ষ থেকে এক গণ আইন অমান্য কর্মসূচী পালন করা হয়। বিশ্বায়নের নীতিমালার প্রভাবে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের মদতে দফায় দফায় মূল্যবৃদ্ধি, মার্কিন সরকারের সাথে কেন্দ্রীয় সরকারের কালা পরমাণু চুক্তি সই এবং খুচরো ব্যবসায় দেশী-বিদেশী বৃহৎ পুঁজির অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে এই গণ আইন অমান্য কর্মসূচী পালিত হয়। হুগলী, হাওড়া, মুর্শিদাবাদ, উঃ ২৪ পরগণা, নদীয়া, বর্ধমান, কলকাতা সহ বিভিন্ন জেলার প্রায় ১২০০ শ্রমিক-কৃষক-ক্ষেতমজুর-ছাত্র-যুব এই কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করেন। কলেজ স্কোয়ার থেকে সোচ্চার মিছিল ধর্মতলায় রাণী রাসমণি রোড পেরিয়ে যেতে গেলে পুলিশ মিছিল আটকে গ্রেপ্তার করে প্রেসিডেন্সি জেলে নিয়ে যায় প্রায় ৩৫০ জনকে। পরে তাদের ছেড়ে দেয় পুলিশ।

এই তিন দফা দাবী ছাড়াও এই মিছিলে উঠে আসে সিঙ্গুরের জমি দিতে অনিচ্ছুক কৃষকদের জমি ফেরানোর দাবীও। পরমাণু চুক্তির বিরোধিতা করেও সিপিএম কেন হরিপুরে পরমাণু চুল্লীর প্রস্তাব এনেছিল, সে কথাও উঠে আসে এদিনের মিছিল থেকে।

সখী, 'গণতন্ত্র' কারে কয়, সেকি কেবলই যাতনাময়

শরিফুল ইসলাম

সম্প্রতি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ঘোষণা করেছেন, অনিচ্ছুক কৃষকরা জমি দিতে রাজি না হওয়ায় বারাসাত-রায়চক সেতু ও রাস্তা নির্মাণের কর্মসূচিটি বাতিল করা হল। মুখ্যমন্ত্রী দূরদর্শী! ইতিপূর্বে 'আমরা ২৩৫, ওরা ৩৫'-এর দম্ভে ধরা-কে সরা জ্ঞান করে তাঁর সরকার ঘোষণা করেছিল, উন্নয়নের স্টিমরোলার চলবেই। সেই মোতাবেক, বহুমানুষের আপত্তি থাকা সত্ত্বেও বারাসাত থেকে রায়চক হয়ে হলদিয়া পর্যন্ত সড়ক ও সেতু নির্মাণের ব্যাপারে কুখ্যাত সালিম-গোষ্ঠীর সঙ্গে কথাবার্তা তাঁরা প্রায় চূড়ান্ত করেও ফেলেছিলেন। তারপরই 'উন্নততর-বামফ্রন্ট' সরকারের সমস্ত হিসেবকে ওলট-পালট করে দিয়ে ঘটনার মোড় ঘোরে অন্যদিকে। তিরিশ বছরের 'শ্মশানের শান্তি' ভুলে রুখে দাঁড়ায় সিঙ্গুর। রুখে দাঁড়ায় নন্দীগ্রাম। প্রথমটায় সরকারের বিশ্বাস হয়নি। তিন-তিনটে দশক ধরে যে পশ্চিমবঙ্গবাসী বামফ্রন্ট সরকারকে প্রায় ঈশ্বর-জ্ঞানে সেলাম ঠুকে এসেছে, সাত চড়েও রা কাড়েনি—বরং এক গালে চড় খেয়ে দিব্যি হাসিমুখে বাড়িয়ে দিয়েছে অন্য গাল, সেই বাধ্য-পোষমানা বঙ্গবাসী হঠাৎ শীত-ঘুম ভেঙে ফোঁস্ করে উঠবে, বুদ্ধবাবুর সরকার তা স্বপ্নেও ভাবেনি। তাই প্রথমে তাঁরা মনে করেছিলেন, বেয়াড়াদের সবক্ শেখাবেন। সিঙ্গুরে পুলিশ নামলো। নন্দীগ্রামে পুলিশের সঙ্গে ক্যাডার। সিঙ্গুরে লাঠি চললো। নন্দীগ্রামে নির্বিচারে গুলি। গুম-খুন থেকে গণধর্ষণ সবক্ শেখাতে কোনও কিছুই বাদ গেল না। তবু বেয়াড়ারা সবক্ শিখলো কই! এমনকি রাইফেলধারী বাইক বাহিনী পাঠিয়ে নন্দীগ্রাম 'পুনর্দখল' করার পর বুদ্ধবাবুর দল যখন কিঞ্চিত স্বস্তিতে, তখনই আবার জোর ধাক্কা। পঞ্চায়েতের ফল প্রকাশের পর দেখা গেল শাসক পার্টি ডাহা ফেল। নন্দীগ্রামকে 'দখলে' রাখা যায়নি! বুদ্ধবাবু প্রাজ্ঞ। বুদ্ধবাবু বিচক্ষণ। পর পর ঘটে যাওয়া এতগুলো ঘটনায় বঙ্গবাসীর নাড়ির গতি যে কিঞ্চিত উল্টো দিকে বইছে, তা তিনি তাঁর উন্নততর বুদ্ধি দিয়ে ঠিক ধরে ফেলেছেন। কাজেই আপাতত আর জোর-জবরদস্তি নয়। মানে, জবরদস্তি করলেও তা বুক বাজিয়ে নয়। লুকিয়ে-চুরিয়ে। 'আমরা ২৩৫ তাই জবরদস্তি করছি তো বেশ করছি'—এই লাইনে তিনি আর নেই। অন্তত সামনের বছর লোকসভা নির্বাচনের আগে তো নয়-ই। তাই এখন তিনি আবার গণতন্ত্রের পক্ষে। 'ওদের-আমাদের' উর্দ্ধে উঠে সকলের মুখ্যমন্ত্রী। সম্প্রতি এক জনসভায় তাঁর বক্তব্য, "আপনারা নন্দীগ্রাম-সিঙ্গুর নিয়ে অনেক কিছুই কাগজে পড়েছেন। একটা জিনিস আপনাদের জানিয়ে দিতে চাই, কোথাও জোর করে জমি আমরা নেব না। এটা আমরা শিখেছি। ...বারাসাত-হলদিয়া রাস্তার জন্য জমি দেওয়া নিয়ে সকলের মত নেই। তাই আমরা এই রাস্তা তৈরি করব না।" (আনন্দবাজার; ১৮ আগস্ট)

কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর এ-হেন 'বোধোদয়ে' রাজ্যবাসী কিঞ্চিত আশ্বস্ত হলেও পিত্তি জ্বলে গেছে আর একটি প্রতিষ্ঠানের। সেটি হলো স্বনামধন্য 'আনন্দবাজার' গোষ্ঠী। বস্তুত রাজ্যবাসীর কাছে 'ব্র্যান্ড-বুদ্ধ'র মাহাত্ম্য প্রচারে যে পত্রিকার ভূমিকা 'গণশক্তি'-কেও হার মানায়, বুদ্ধবাবুর পরাজয় মানে যে তাদেরও পরাজয়! তাই রাগে আনন্দবাজার অগ্নিশর্মা। ১৯ অগাস্ট-এর সম্পাদকীয় কলমে বঙ্গবাসীর চোদ্দ পুরুষকে উদ্ধার করে তারা লিখেছে, "...পরিবর্তন হইবে না, যাহা যেমন ছিল, তাহা ঠিক তেমনই থাকিবে, এমন সমাচারে বঙ্গজনতার বৃহদংশ আহ্লাদিত। খেয়াল রাখা ভাল, এই স্থিতাবস্থাকামী আহ্লাদটিই কিন্তু অস্বস্তির কারন। কেননা, তাহা বাঙালির চিরাচরিত আত্মঘাতেরই নামান্তর। যে কোনও মূল্যে স্থিতাবস্থা বজায় রাখাই যে জাতির অভীষ্ট, তাহারা

শেষাংশ ৭ পৃষ্ঠায়

সম্পাদকীয়
শ্রমিকশক্তি
৬ষ্ঠ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, আগস্ট '০৮

কাশ্মীর

শাসকরা সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে খেলছে

কাশ্মীর উপত্যকা আবার অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছে। কাশ্মীরে গণ্ডগোল কোন নতুন ঘটনা নয়। কিন্তু এবারে যে ইস্যুতে যেভাবে গণ্ডগোল হল তাতে যথেষ্ট উদ্বেগের কারণ আছে।

মানুষকে ভাগ করে শাসন করার নীতি শুধু বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ছিল তাই নয়, তাদের এদেশীয় অনুচররা অর্থাৎ ভারতের শাসকশ্রেণী সেই নীতিকে বারে বারে কাজে লাগিয়েছে। কাশ্মীরে সেই সাম্প্রদায়িক তাস খেলেছে কংগ্রেস। শাসকশ্রেণীর অপর বৃহৎ দল বিজেপি সেই তাস চিনতে ভুল করেনি। জম্মুর হিন্দুদের উস্কে দিয়ে গোটা উপত্যকায় সাম্প্রদায়িক জিগির তুলে সারা দেশে তারা হিন্দু ভোটকে নিজের পক্ষে টানার কাজে সক্রিয় হয়ে উঠেছে।

একটি জমি হস্তান্তরকে কেন্দ্র করে এবারের ঘটনার সূত্রপাত। প্রতি বছরই বহু মানুষ অমরনাথে যান— কেউ শুধু বেড়াতে, কেউ বৈষ্ণোদেবীর মন্দিরে পুজো দিতে। দেশের এরকম বহু পর্যটন কেন্দ্রেই মন্দির, মসজিদ বা গুরুদ্বারা আছে। ফলতঃ এই পর্যটন কেন্দ্রগুলিকে তীর্থস্থান হিসাবে দেখানো হয়ে থাকে। সেই অর্থে অমরনাথ একটি তীর্থস্থান। এতদিন এই মন্দিরে পুজো ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ছিল দুটি পুরোহিত পরিবার এবং একটি ফকির পরিবারের উপর। যাত্রীদের যাতায়াত ও নিরাপত্তার দায়িত্ব ছিল রাজ্যসরকারের। সম্প্রতি যাত্রীদের অধিকতর স্বাচ্ছন্দের অজুহাত দিয়ে রাজ্যপালের সভাপতিত্বে অমরনাথ মন্দির ধর্মস্থান সংস্থা নামে একটি সংস্থা তৈরি করা হয় এবং এই সংস্থার হাতে মন্দির ও তীর্থযাত্রা সম্পর্কিত যাবতীয় অধিকার ন্যস্ত হয়। এতদিন দায়িত্বে থাকা দুই পুরোহিত পরিবার ও এক ফকির পরিবারের কোন সদস্যকে কিন্তু সংস্থার সভাপতি বা সচিব কোন পদেই রাখা হয়নি। যাদের রাখা হয়েছে তারা দুজনেই অ-কাশ্মীরী হিন্দু। যাত্রীনিবাস ইত্যাদি তৈরির জন্য বনবিভাগের ৪০ হেক্টর জমি এই সংস্থাকে দান করা হয়। দেশের আইন অনুযায়ী কিন্তু কাশ্মীরের কোন জমি হস্তান্তরযোগ্য নয়। এই জমি হস্তান্তরের বিরুদ্ধে কাশ্মীরে বিক্ষোভ দেখানো হয়। তাঁদের বক্তব্য এই জমিতে হোটেল তৈরি করে বাইরে থেকে লোক এনে কাশ্মীরে জনসংখ্যার যে অনুপাত আছে তাকে বদলে ফেলা হবে। এই ঘটনায় কংগ্রেস জোট সরকার সংকটে পড়ে। ৩০ জুন বনবিভাগের এই জমি দেওয়ার নির্দেশ প্রত্যাহার করা হয়। নির্দেশ প্রত্যাহার করলে জম্মুর হিন্দুরা পাল্টা আন্দোলনে নেমে পড়ে। এবং ২৬ জুলাই থেকে তারা হাইওয়ে বন্‌ধ শুরু করে। একদিকে কার্ফু অন্যদিকে হাইওয়ে বন্‌ধ। কাশ্মীরে খাদ্যসামগ্রী, ব্যাঙ্কের নগদ টাকা, গ্যাস এবং সমস্ত নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের ব্যাপক সংকট সৃষ্টি হয়। কাশ্মীরের মানুষ কার্ফুকে অগ্রাহ্য করেই পথে নেমে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। জম্মু, কাশ্মীর উভয় জায়গাতেই বহু মানুষ হতাহত হন।

কাশ্মীর উপত্যকায় বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষ বসবাস করেন। কাশ্মীরে ৯ শতাংশ মুসলমান ধর্মাবল্বী, জম্মুতে হিন্দুদের সংখ্যা বেশি, লাদাখে সংখ্যাধিক মানুষ বৌদ্ধ। কিন্তু লাদাখের লোকসংখ্যা কম (মোট জনসংখ্যার ২ শতাংশ)।

স্বাধীনতার সময় ভারতবর্ষকে যখন ধর্মের ভিত্তিতে দুভাগে ভাগ করা হল কাশ্মীর কিন্তু কোন পক্ষেই যায়নি। কথা ছিল কাশ্মীরের মানুষ ঠিক করবেন তারা কিভাবে থাকবেন। স্বাধীনতার পর থেকে কাশ্মীরী জনতার সেই অধিকারকে অস্বীকার করেছে ভারত ও পাকিস্তানের শাসকরা। কাশ্মীরী জাতিসত্তার আন্দোলনও বারবার ফেটে পড়েছে। সেনাবাহিনীর নির্মম দমন পীড়নেও সে আন্দোলন স্তব্ধ করা যায়নি। বৃটিশ শাসকদের মতোই ভারতের শাসকরাও বুঝেছে কাশ্মীরীদের শাসন করার শ্রেষ্ঠ উপায় হিন্দু-মুসলমানের লড়াই লাগিয়ে দেওয়া। জমি হস্তান্তর এবং তা প্রত্যাহারকে কেন্দ্র করে কাশ্মীর উপত্যকায় আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে কেন্দ্র সরকার আগুন পুহিয়েছে, আর বিজেপি সেই আগুনে ঘি ঢেলেছে। বিজেপি-র আশা এই আগুন ছড়িয়ে পড়বে সারা দেশে। আর যত দাঙ্গার বাতাবরণ তৈরি হবে ততো বিজেপি-র হিন্দুভোট বাড়বে। কংগ্রেস উপরেরটাও পাড়তে চায়, তলারটাও কুড়োতে চায়।

এইভাবে তারা একদিকে যেমন কাশ্মীরী জাতিসত্তার আন্দোলনকে সাম্প্রদায়িক বিষে বিষিয়ে দিতে চায় তেমনই মূল্যবৃদ্ধি, খুচরো ব্যবসায় বহুজাতিকদের অনুপ্রবেশ, কুখ্যাত পরমাণু চুক্তি, সেজ প্রকল্প ইত্যাদি থেকে মানুষের দৃষ্টি সরিয়ে দিতে চায়।

রাজনৈতিক সংকটে দীর্ণ পাকিস্তানের শাসকশ্রেণীও সে দেশের গরীব মানুষের দৃষ্টি ঘোরানোর জন্য নরম গরম বিবৃতি দিয়ে চলেছে। ব্যবসার স্বার্থে যে ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ককে কিছুটা মোলায়েম করা হয়েছিল তাতে ফের কিছুটা টেনশন তৈরি করা হচ্ছে। প্রয়োজন হলে কারগিল ধরনের একটা যুদ্ধ-যুদ্ধ ব্যাপারও তৈরি করা হতে পারে। সন্দেহ নেই কাশ্মীর উপত্যকায় জমি হস্তান্তরকে কেন্দ্র করে যে গণ্ডগোল তা শাসকদেরই তৈরি। কাশ্মীরী জনগণকে ঠিক করতে হবে কি করে এই সাম্প্রদায়িকতার বিষ জাল কেটে বেরিয়ে এসে ধর্মনির্বিশেষে কাশ্মীরী জাতিসত্তার আজাদীর আন্দোলনকে সঠিক পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়।

বোলপুরে নির্মীয়মান শপিং মলের বিজ্ঞাপনী হোর্ডিং নামিয়ে দিলেন ছোট ব্যবসায়ীরা

শ্রমিক-কর্মচারীদের বঞ্চনা করেই ওয়ালমার্ট বিশাল সম্পদ গড়ে তুলেছে

কুশল দেবনাথ

গোটাদেশে খুচরা ব্যবসায় দেশি-বিদেশি বৃহৎ পুঁজিপতি গোষ্ঠী ঝাঁপিয়ে পড়েছে। প্যান্টালুন, রিলায়েন্স, পিরামিড, ট্রেন্ট প্রভৃতি গোষ্ঠী হাজার হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। ভারতী গ্রুপ ৩১,৫০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করে গোটাদেশে রিটেল নেটওয়ার্ক গড়ে তুলবে। এর মধ্যে থাকবে ১০০টি বড় মল ও কয়েকশো ছোট দোকান। আমেরিকার রিটেল দৈত্য ওয়ালমার্টের সাথে যৌথ উদ্যোগ তারা ব্যবসা করবে। যেহেতু এখনও পর্যন্ত রিটেলে সিঙ্গল ব্রাণ্ডের ক্ষেত্রে ৫১ শতাংশ এফ.ডি.আই. (করেন ডায়রেক্ট ইনভেস্টমেন্ট)-এর অনুমতি পাওয়া গেছে তাই ওয়ালমার্ট এই যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এই ওয়ালমার্ট আমেরিকাতে কিভাবে ব্যবসা চালায় তার কিছু নমুনা তুলে ধরা হচ্ছে। আমেরিকার সবচেয়ে বড় রিটেল প্রতিষ্ঠান ওয়ালমার্ট। এর স্থায়ী ও অস্থায়ী কর্মীসংস্থার সংস্থা ৩ লাখ ৩০ হাজার। এদের বড় বড় দোকান থেকে ঘোষণা, আসবাবপত্র থেকে মুদিখানায় দ্রব্যাদি সবই পাওয়া যায়। এই কোম্পানীর বার্ষিক রেভিনিউ আমেরিকার ডিডিপি-র ২ শতাংশ। এই ওয়ালমার্ট এত বড় ব্যবসা গড়ে তুলেছে আমেরিকার শ্রমিক-কর্মচারীদের বঞ্চনা করে। কম পয়সায় মজুর খাটানো, আমেরিকার শ্রম আইন না মানাই হচ্ছে ওয়ালমার্টের পরিচালন পদ্ধতি। ২০০৪ সালে জর্জ জিলার ওয়ালমার্ট সম্বন্ধে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে তাতে দেখা যায় শ্রমিকদের সংগঠন করার অধিকার ওয়ালমার্ট দেয় না। ওয়ালমার্টের শ্রমিকরা সংগঠিত হবার চেষ্টা করলে ভীতি প্রদর্শন, হামলা, চাকুরির থেকে বরখাস্ত করার পদ্ধতি কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করে। ফলস্বরূপ ওয়ালমার্টের একটি দোকানেও শ্রমিকরা ইউনিয়ন সংগঠিত করতে পারেনি। ওয়ালমার্ট কর্তৃপক্ষের ভয়ংকর ইউনিয়ন বিরোধী ভূমিকার জন্য আমেরিকার অন্যতম বৃহৎ এত বড় বেসরকারি কারখানাতে শ্রমিকরা ইউনিয়ন সংগঠিত করতে পারেনি। শুধু তাই নয় ওয়ালমার্টের তিনভাগের একভাগ শ্রমিক আংশিক সময়ের কর্মী।

শ্রমিক-কর্মচারীদের এই ইউনিয়ন সংগঠন না থাকার জন্য অত্যন্ত কম মজুরিতে তারা কাজ করতে বাধ্য হয়। যেখানে অন্যান্য সুপার মার্কেটের শ্রমিক-কর্মচারীরা মাসে ন্যূনতম ১২০০ ডলার বেতন পায় সেখানে ওয়ালমার্টের শ্রমিক-কর্মচারীরা পায় ১০০০ ডলার। আমেরিকার ফেডারেল পভার্টি সীমা ১৪,৬৩০ ডলার তিনজন ধরে একটি পরিবারের ক্ষেত্রে সেখানে ওয়ালমার্টের বহু শ্রমিক কর্মচারীর বার্ষিক আয় ১২ হাজার জলার। শুধু কম পয়সার কাজ করানো নয়, সামাজিক সুরক্ষার নানা দিককে বলপূর্বক অগ্রাহ্য করে চলেছে ওয়ালমার্ট কর্তৃপক্ষ। ভারতে সংগঠিত রিটেল ব্যবসার ক্ষেত্রে ওয়ালমার্ট ঢুকতে চলেছে, এর ফলে শুধু ছোট দোকানদার, ব্যবসায়ী কিংবা ক্রেতারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না, ক্ষতিগ্রস্ত হবে অসংখ্য শ্রমিক কর্মচারী। কারণ তাদের সংগঠিত হবার কোন দাবী ওয়ালমার্ট মানবে না। আর শ্রমিক কর্মচারীরা যত দিন সংগঠিত হবার প্রক্রিয়ায় নিজেদের যুক্ত করতে পারবেন না ততদিক কম পয়সা কাজ করা থেকে কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন জোর-জুলুম মানতে তারা বাধ্য হবেন। আমেরিকাতে ওয়ালমার্টের বিশাল সম্পদ গড়ে উঠেছে শ্রমিক কর্মচারীদের বঞ্চনা করে। এদেশেও তারা সেটা করতে চায়, অতএব এখন থেকেই আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।

রিটেল ব্যবসায় এদেশে দেশি-বিদেশি বড় পুঁজিপতিদের পরিকল্পনা

(১) প্যান্টালুন রিটেল ব্যবসায় প্রসার ঘটাবে। ২০১০ সালের মধ্যে ৩০ মিলিয়ন স্কোয়ারফুট জায়গা জুড়ে তাদের ব্যবসা চলবে। রিটেল, বীমা, রিয়েল এস্টেট-এ ব্যবসা প্রসারিত করবে। ২০১১-১২ সালের মধ্যে প্রস্তাবিত বিনিয়োগ ৩০,০০০ হাজার কোটি টাকা।

(২) রিলায়েন্স ৩০ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে রিটেল শপ খুলতে। আনুমানিক ৯০,০০০ হাজার কোটি টাকায় ব্যবসা করবে ২০১০ সালের মধ্যে।

(৩) আর পি জি স্পেন্সারের হাইপায় মার্কেট ৪ মিলিয়ন স্কোয়ারফুট ২০১০ সালের মধ্যে ও ৫০টা মিউজিক ওয়ার্ল্ড।

(৪) লাইফস্টাইল আগামী ৫ বছরে ৪৫০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে।

(৫) রাহেজা শপার্স স্টপ-মল-হোমস্টপ-হাইপার মার্কেট যার নতুন নাম হাইপারসিটি। ৫৫টা হাইপার মার্কেট ২০১৫ সালের মধ্যে।

(৬) ত্রিনেত্র এ ভি বিড়লা গোষ্ঠীর বার্ষিক টার্নওভার ৩০০ কোটি টাকা।

(৭) বিশাল গ্রুপ—জল, রিটেল, হাইপারসিটি গড়তে প্রায় ৬০০০ কোটি টাকার ব্যবসা করে।

(৮) ভারতী ওয়ালমার্টের সাথে যৌথ উদ্যোগে ৩১,৫০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে। ১০০টা হাইপার মল ও কয়েকশো দোকান খুলবে।

ফলাফল

দেশি-বিদেশি পুঁজি বর্তমান খুচরো ব্যবসায় ২০ ভাগ দখল করলে কাজ পাবে ৪৪ হাজার লোক, কাজ হারাবে প্রায় ৮০ লাখ মানুষ।

সুতরাং খুচরো ব্যবসায় দেশি-বিদেশি বৃহৎ পুঁজির অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে।

শপিং মলের বিরুদ্ধে

আন্দোলনে বোলপুরের ছোট ব্যবসায়ীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি: দেশী-বিদেশী বৃহৎ পুঁজির একচেটিয়া আগ্রাসনের বিরুদ্ধে বোলপুরের ছোটব্যবসায়ীরা রুখে দাঁড়িয়েছেন, নিজেদের জীবন-জীবিকার প্রশ্নকে সামনে রেখে। সাধারনভাবে বোলপুর অঞ্চলের মানুষের খুব ক্ষুদ্রতর একটি অংশ চাকুরীজীবি এবং এর বাইরে প্রায় আশি শতাংশ মানুষ মূলতঃ বিভিন্ন মাপের ব্যবসায়ী এবং ব্যবসা সংক্রান্ত পেশার সাথে যুক্ত। ফলতঃ 'রিজেন্ট স্টেশন' নামক শপিং মলটি পৌরসভার চলমান সুপার মার্কেটের জায়গায় তৈরী হ'লে তাঁরা অর্থনৈতিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন এবং স্বাভাবিক জীবনযাত্রারও শোচনীয় অবস্থা হবে।

'বোলপুর ব্যবসায়ী সংঘ'-র সভাপতি আঙুর খান জানালেন ইতিপূর্বে আন্দোলনের প্রারম্ভিক পর্যায়ে পৌরসভায় ডেপুটেশন দেওয়া হয়। কিন্তু পৌরপিতার কাছ থেকে কোনো সদুত্তর না পাওয়ায় কনভেনশন আহ্বান করা হয়। স্বাভাবিক ভাবেই সি.পি.এম ছাড়া সমস্ত দল, গনসংগঠন এবং শুভবুদ্ধিসম্পন্ন নাগরিকরা সমবেত হন এবং আন্দোলনের জন্য অঙ্গীকার করেন। বোলপুরের লড়াকু জননেতা শৈলেন মিশ্র তত্ত্বগত ভাবে আমাদের জানালেন এই ধরণের শপিংমলের ক্ষতিকর দিক কতটা এবং সংখ্যাগত দিক দিয়েও দেখালেন দেশী-বিদেশী বিভিন্ন সংস্থা কীভাবে ভারতের বুকে আগামী দিনে শোষণ নামিয়ে আনতে চলেছে। বোলপুরের পাশাপাশি সিউড়ি সহ অন্যান্য জায়গায় এমনই শপিংমল তৈরীর সম্ভাবনা গড়ে ওঠায় তিনি জানান গোটা বীরভূম জেলায় বৃহৎ পুঁজির বিরুদ্ধে আগামী দিনে আরো বড়মাপের আন্দোলন সংগঠিত হবে।

বোলপুরের সাধারন জনগনের লড়াকু মানসিকতার ইতিহাস সুপ্রাচীন। তারই ধারাবাহিকতায় এই আগ্রাসনকে রুখতে তারা বদ্ধপরিকর। এর আগেও বিক্ষোভ প্রদর্শন, শপিংমলের কনস্ট্রাকশনের কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

ক্রেতাসাধারনের চোখে ধূলো দিয়ে, ঝাঁ চকচকে রঙিন অন্ধকারে ডুবিয়ে বৃহৎ পুঁজি নেমেছে তার বাজার দখল করতে। এখন ক্ষতির সম্মুখীন খুচরো ব্যবসায়ীর সাথে সাথে সাধারন জনগন যতক্ষন না পর্যন্ত কাঁধে কাঁধে আন্দোলনে সামিল হচ্ছে ততদিন এ আগ্রাসন রোখা যাবে না।

অতীত আন্দোলন থেকে

ঐতিহাসিক খাদ্য আন্দোলন : ১৯৫৯ ও ১৯৬৬ সাল

১৯৫৯ সালে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের অস্বাভাবিক দাম বেড়ে যায়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মূল্য নিয়ন্ত্রণের নীতির ফলে বাজারে ধান, চাল ইত্যাদি সামগ্রী এলেও তার মূল্য প্রচণ্ড বৃদ্ধি পায়। ফলে অনাহারে থাকার মানুষের সংখ্যা বাড়ছিল। ঐ সময় এ.আই.টি.ইউ.সি-র সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবে লেখা হয় 'যে হারে খাদ্যসম্ভারের মূল্য বাড়ছে তাতে অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদির দর আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে, দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙে পড়বে।' এই অবস্থায় বিভিন্ন বামপন্থী দল, গণসংগঠনসমূহকে নিয়ে গড়ে ওঠে মূল্যবৃদ্ধি ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটি। কমিটি সিদ্ধান্ত নেয় ২০ আগস্ট থেকে সমগ্র রাজ্যে তীব্র গণআন্দোলন গড়ে তোলা হবে। কমিটি যে দাবিসমূহ তৈরি করে তাতে ছিল (ক) সমস্ত জেলায় কৃষকদের খাজনা মকুব করা (খ) প্রাপ্তবয়স্ক লোকেদের মাথাপিছু খাদ্যসম্ভারের পরিমাণ বৃদ্ধি (গ) গ্রাম ও শহর সর্বত্র ১৭ টাকা মন ধরে চাল বিক্রি (ঘ) কেন্দ্রীয় সরকারের দেওয়া ঘাটতি খাদ্যসম্ভার পূরণ (ঙ) কৃত্রিম ঘাটতি সৃষ্টিকারী চোরাকারবারী ও মজুতদারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদি।

ঐ সংগ্রাম শুরু হওয়ার আগেই পুলিশ সমগ্র রাজ্যব্যাপী নিবর্তনমূলক আটক আইনে আন্দোলনের নেতা ও কর্মীদের গ্রেপ্তার করে। মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে ও গ্রেপ্তার হওয়া বন্দীদের মুক্তির দাবিতে মূল্যবৃদ্ধি ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটি রাজভবন অভিযান ও আইন অমান্য কর্মসূচী গ্রহণ করে। গ্রামবাংলা থেকে হাজার হাজার কৃষক মহাকরণ অভিযানে সামিল হয়। শহরের শ্রমিকশ্রেণী, ছাত্রছাত্রী সহ অন্যান্য মেহনতী মানুষের লড়াকু মেজাজে ঐ অভিযানে সামিল হন। মিছিলনগরী কলকাতা সাক্ষী হয় এক অভূতপূর্ব প্রতিবাদী মিছিলের। লক্ষাধিক মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ভেঙে যায় পুলিশের বাহিনী। কংগ্রেসী সরকারের পুলিশ নির্বিচারে লাঠি চালায় মিছিলে অংশগ্রহণকারীদের উপর। পুলিশের আক্রমণে ৮০ জন আন্দোলনকারী সেদিন শহীদ হন। কংগ্রেসী সরকারের এই নৃশংস বর্বরতায় উত্তাল হয়ে ওঠে এ বাংলা। কলকাতার সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে বিভিন্ন ছাত্রসংগঠনের ডাকে ছাত্ররা জমায়েত হয়ে এবং তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ের বাড়ি ঘেরাও এর ডাক দেয়। ঐ বিশাল ছাত্রমিছিলের উপর পুলিশ গুলি চালায়। তিনজন ছাত্র শহীদ হয়। মূল্যবৃদ্ধি ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটি ৩ সেপ্টেম্বর সাধারণ ধর্মঘট ও হরতালের ডাক দেয়। ৩ সেপ্টেম্বর এই বাংলায় অভূতপূর্ব ধর্মঘট পালিত হয়। ঐ সময় মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় গোটা আন্দোলনকে গুণ্ডামি বলে আখ্যায়িত করেন। কমিউনিস্ট পার্টি রাজ্য পরিষদের পক্ষে জ্যোতি বসু বলেন, "খাদ্য ও খাদ্যমন্ত্রীর অপসারণের দাবিতে যে শান্তিপূর্ণ আলোচনা চলছিল তাকে রাজ্যসরকার সুপরিকল্পিতভাবে চক্রান্ত করে সামগ্রিকভাবে শান্তিপূর্ণ পথ থেকে বিচ্যুত করছে। কাজ দ্বারা সরকার জনগণের ধৈর্যচ্যুতি ঘটিয়েছে এবং সমাজবিরোধী দমনের নামে হত্যাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করছে। সরকারি সম্পদ হানি দুঃখের বিষয় হলেও মানবজীবনের সরকারি সম্পত্তি বেশি মূল্যবান নয়।"

৫৯ সালের পর ফের ৬৬ সালে খাদ্য আন্দোলনে উত্তাল হয় পশ্চিমবঙ্গ। ১৯৬৬ সালের এপ্রিল মাস জুড়ে উত্তাল হয়ে উঠল গোটা রাজ্য। মোটেই আকস্মিক নয় এই আন্দোলন। ১৯৬৫ সাল থেকে বাতাসে ভেসে আসছিল বারুদের গন্ধ। ১৯৬৪-৬৫ সাল থেকেই ভারতে খাদ্যের দাম চড়া। সরকারি হিসাবেই গোটা দেশে উপোসী মানুষের সংখ্যা ৩ কোটি। খাদ্যসংকট কবলিত ভারতের জন্য পি.এল ৪৮০ অনুযায়ী অতিরিক্ত ১৫ লাখ টন গণসরবরাহ করতে রাজী হয় আমেরিকা। পশ্চিমবঙ্গে খাদ্য সমস্যা লেগেই ছিল। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের অভাবনীয় মূল্যবৃদ্ধি হয়। ১৯৬৪ সালে গঠিত হয় রাষ্ট্রীয় সংগ্রাম সমিতি। রাষ্ট্রীয় সংগ্রাম সমিতি খাদ্য সংকট ও মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে লাগাতার সংগ্রাম শুরু করে। ৬৪-৬৫ সাল পেরিয়ে ৬৬-তে সমস্যা আরো গভীর হয়। এই সময় তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেনের নেতৃত্বে গঠিত কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা কয়েকটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সেগুলি হলো, 'কলকাতা ও শিল্পাঞ্চলে পূর্ণ রেশনিং (মাথাপিছু চাল ও গম মিলিয়ে মোট ১৯০০ গ্রাম) মফস্বল শহর ও অকৃষক মানুষজনের জন্য আধা রেশনিং, লেভির মাধ্যমে উদ্বৃত্ত ধান-চাল সংগ্রহ) এবং মূল্য নিয়ন্ত্রণ। সরকারি সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১৫ লক্ষ টন ধন। এই সংগ্রহ সরকার করতে ব্যর্থ হয়। কারণ লেভীর ধান সংগ্রহ মূল্য ছিল মন প্রতি ১৫-১৭ টাকা। অথচ সেখানে বাজার দর ছিল ৩৫ টাকা। জোতদার, মহাজন, ধনীচাষীরা পুলিশের নাকের ডগায় চাল পাচার শুরু করে। পশ্চিমবঙ্গ চালের চোরাকারবারীদের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়।

সরকারি অপদার্থতার জন্য রাজ্য জুড়ে বিক্ষোভ শুরু হয়, খাদ্যের সাথে যুক্ত হয় জ্বালানি তেল কেরোসিনের সংকট। এই সময় ১৬ ফেব্রুয়ারি সকাল ১১টায় বসিরহাট শহরে খাদ্যের জ্বালানির দাবিতে হাজার হাজার ছাত্র ও কৃষক মিছিল করে। ঐ মিছিলের উপর পুলিস গুলি চালায়। গুলি চালনার প্রতিবাদে ২৪ ঘন্টার মধ্যে ২৪ পরগণায় ২৫০ বর্গমাইল এলাকা জুড়ে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। স্বরূপনগরে পুলিশের গুলিতে শহীদ হয় নুরুল ইসলাম। স্ফুলিঙ্গ দাবানলে পরিণত হয়। ফেব্রুয়ারি থেকে মার্চ মাস জুড়ে গোটা রাজ্য আন্দোলনে উত্তাল হয়ে ওঠে। কৃষ্ণনগর, রানাঘাট, বেহালা, হিন্দমোটরে আন্দোলন এমন পর্যায়ে যায় যে সেনাবাহিনীকে সরকার নামায়। সমস্ত স্কুল কলেজ সরকার বন্ধ করে দেয়। ৫ মার্চ কৃষ্ণনগরে ছাত্র মিছিলে পুলিশ গুলি চালালে আনন্দ হাইত শহীদ হয়। ১০ মার্চ হয় বাংলা বনধ। অতীতের সমস্ত বন্ধ হরতাল ম্লান হয় ১০ মার্চ বাংলা বনধের কাছে। গোটা রাজ্যের সর্বস্তরের প্রতিবাদী মানুষ রাস্তায় নামে। বিভিন্ন জায়গায় জনতার সঙ্গে পুলিশের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। অন্তত ৪৫ জন শহীদদের মৃত্যুবরণ করে। নিশ্চুপ থাকেনি কলকাতার বুদ্ধিজীবী সমাজ। ১৪ মার্চ অসংখ্য মানুষ মৌনমিছিল করে কলকাতায়। কাতারে কাতারে মানুষ রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে শহীদ বেদীতে মর্মস্পর্শী শোকগম্ভীর পরিবেশে শ্রদ্ধা জানায়। মৌনমিছিলের দুপাশে অসংখ্য মানুষ। মিছিলে ছিলেন সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন, শোভা সেন, সৌমিত্র চ্যাটার্জী, ত্রিদিব চৌধুরী, ভূপেন গুপ্ত প্রমুখ। সেইসময় বৈদ্যনাথ চক্রবর্তী নামে একজন একটি অসাধারণ কবিতা লেখেন দৈনিক বসুমতীতে।

পথ বহুদূর সামনে চড়াই— তবুও মিছিল এগিয়ে যাও
রাত কতো হলো— প্রশ্ন করো না, শুধু বোবাদের ভরসা দাও
মৌন মিছিলে যদি জাগে আজ ভাঙা পাঁজরের যন্ত্রণা,
তবু রোদে পোড়া হাসিমুখে দাও এগিয়ে চলার মন্ত্রণা।
স্তব্ধ বাতাস মাথার আকাশ ব্যথার ভারেতে নামতে চায়
পথের সাথীকে পথে ফেলে এসে বুঝি মন তোর কান্না পায়।
তবু সাবধান শহীদের স্মৃতি বুকের আগুনে জেলে রাখিস,
ক্লান্তিললাটে রক্ত তিলক সাথীর কপালে পরিয়ে দিস।
থেমো না মিছিল— সামনে অদূরে শেষ বাঁক বুঝি রয়েছে ওই,
হৃদয় এখন প্রশ্ন করো না— কি পেতে পারতে পেয়েছো কই?
আজকে মিছিলে স্বপ্ন তোমার বাসর পাতার সময় নাই
তারচেয়ে এসো মৌন-মিছিলে বুকের আগুন ছড়িয়ে যাই।
মিছিলে মিছিলে মিশে যাক আজ তোমার-আমার ছোটো জীবন,
মহাজীবনের ডাক শুনে আজ খুলবে না দ্বার কোন কৃপণ?
নতুন সমাজ, নতুন হৃদয়, নতুন কবিতা মিছিল চায়
ক্ষুধায় মিছিল, দরিদ্র মিছিল, মৌনমিছিল-মিছিল যায়।

তথ্যসূত্র : ঐ সময়কার আনন্দবাজার, বসুমতী,খাদ্য আন্দোলন ১৯৬৬ ও রেশন বিদ্রোহ ২০০৭— দেবাংশু দাশগুপ্ত, জোয়ার-ভাঁটার ষাট সত্তর—অমলেন্দু সেনগুপ্ত

টাটাকাহিনী

বিশেষ প্রতিবেদন: টাটা চলে গেলে আমাদের কি হবে' বলে তারস্বরে কান্না জুড়েছে যারা, আর তাদের কান্নায় হতচকিত হয়ে যারা থ মেরে গেছেন— সত্যিই তো টাটার মত এমন পূত-পবিত্র পুণ্যবাণ পুঁজিপতি পুচ্ছপ্রদর্শনপূর্বক পলায়ন করলে রাজ্যের মানুষের, কর্মসংস্থানপ্রার্থী লক্ষ-কোটির জন্য আর কোন অবতারই বা আসবে দয়া করে, ভেবে কুল পাচ্ছেন না, যারা টাটাকে কৃষ্ণ কিংবা কামধেনু বা প্রায় সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনকারী বিশ্বকর্মা বলে ঠাওড়েছেন, এই লেখাটা তাঁদের জন্য, তাঁদের একবার জানান দেওয়ার জন্য বা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য যে টাটাও এক মুনাফাখোর শ্রমিকশোষণকারী পুঁজিপতিই, যাদের ইতিহাসে অন্য যে কোন পুঁজিপতির মতই লেখা আছে শোষণ আর অন্যায়ের বৃত্তান্ত। এখন স্তুতি করতে গিয়ে সেকথা ভুলে গেলে হবে?

টাটা পরিবারভিত্তিক বহুজাতিক কোম্পানীটির ২০০৫ সালের আয়ের পরিমাণ ছিল ৭৬,৫০০ কোটি টাকা। যা দিয়ে তাদের যাত্রা শুরু, সেই টাটা স্টীল তৈরী হয়েছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সহযোগিতায়, তাদের সাথে নানা ব্যবসায়িক চুক্তির মাধ্যমে ঝাড়খণ্ড ও উড়িষ্যাতে ব্যাপক হারে আদিবাসী মানুষের জমি কেড়ে নিয়ে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের মদতে অনৈতিভাবে ভারত থেকে চীনে আফিম সরবরাহকারী জাহাজ চালানো, রাণী ভিক্টোরিয়াকে ভারতসম্রাজ্ঞী ঘোষণার দিনে(১লা জানুয়ারী ১৮৭৭) টাটার প্রথম কারখানা স্থাপন এবং তার নাম সম্রাজ্ঞীর নামানুসারে দেওয়া, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে দাঁড়িয়ে উত্তর ও পূর্ব আফ্রিকাতে তাদের যুদ্ধ পরিকল্পনার জন্য সস্তায় মাল সরবরাহ—এসবই টাটার ইতিহাসের ছবি।

২০০৫ সালে বুশ-মনমোহনের ক্রমবর্ধমান বোঝাপড়ার সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে ভারত ও মার্কিন বাণিজ্যের সিইও দের এক ফোরাম গড়ে ওঠে, যার উদ্দেশ্য ছিল 'দুই দেশের বাণিজ্য সম্পর্কের উন্নতির পথ' বাতলানো। রতন টাটার সহ-সভাপতিত্বে সেই ফোরাম এক গুচ্ছ প্রস্তাব পেশ করে যার মধ্যে ছিল শ্রম আইন শিথিল করা, বিশেষ আর্থিক অঞ্চল আইন, শ্রমিকদের অবসরকালীন সুবিধা ও কোম্পানীগুলির সামাজিক দায়বদ্ধতা হ্রাসের প্রস্তাব।

গণতন্ত্রের শত্রু

টাটাদের হাতেই রয়েছে ভারতবর্ষের একমাত্র শহর— জামশেদপুর, যেখানে ভারতের সংবিধান মোতাবেক স্থানীয় জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত করে স্থানীয় প্রশাসন চালানোর বদলে টাটাদের নিজস্ব কর্পোরেট প্রশাসনিক যন্ত্রই চলে জনতার ওপর, নির্বাচিতপুরসভার বদলে।

বিশ্বজুড়ে ধিকৃত মায়ানমার (বার্মা)-এর সামরিক জুন্টা সরকারকে যন্ত্রপাতি আর গাড়ি সরবরাহ করে সহযোগিতা করতে নেমেছে টাটারা। কিপরীতে আমরা দেখেছি পেপসিকোর মত কোম্পানীও মায়ানমার থেকে ব্যবসা গুটিয়ে নিয়েছে, সেখানে মানবাধিকার লাঞ্ছিত বলে অভিযোগ তুলে।

আদিবাসীদের জমি লুঠ ও তাঁদের ওপর সন্ত্রাস

টাটা ব্রিটিশ সরকারের বদান্যতায় জামশেদপুর ও নোয়ামুন্ডিতে ৩৫৬৪ একর জমি পায় মাত্র ৪৬,৩৩২ টাকায়। আদিবাসীরা উচ্ছেদ হয়ে যান, তারা টাটার কাজ করতে অস্বীকার করে। টাটারা তখন কোশাম গাছ নির্বিচারে কেটে দেয়, যে গাছ থেকে সংগৃহীত নানা সামগ্রী ছিল আদিবাসীদের জীবনধারণের উপায়। আদিবাসীরা তখন বাধ্য হয় টাটার কাজ করতে।

এই ধারাবাহিকতা টাটাদের তরফে চলেছে। কখনো আগারিয়া টোলার মত ঝর্ণা ধ্বংস, কখনো সুখিন্দা ভ্যালি ক্রোমাইট খনি থেকে ব্যাপক দূষণ সৃষ্টি, কখনো নাগারাহোল ন্যাশনাল পার্কে পাঁচতারা রিসর্টের ব্যবস্থা করে আদিবাসী মানুষকে টাটারা বিপদের মুখে ফেলেছে বারবার।

আর এসবের বিরুদ্ধে, জমি লুঠের বিরুদ্ধে যখন আদিবাসীরা প্রতিবাদ করতে গেছে, তাদের ওপর নেমে এসেছে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস, টাটাদের অঙ্গুলিহেলনে। সিঙ্গুরের কথা আমাদের জানা, ২০০৬-এর ২রা জানুয়ারী উড়িষ্যার কলিঙ্গনগরে টাটার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সামিল ১৩ জনকে পুলিশ গুলি করে হত্যা করে, মৃতদেহগুলির থেকে হাত কেটে নেওয়া হয়, কেটে নেওয়া হয় মহিলাদের স্তনও। টাটারা তারপরও বলে যে তাদের কাজ চলবে। এরও আগে ১৯৮০-র ৭ই সেপ্টেম্বর গুয়ার আদিবাসীরা নোয়ামুন্ডিতে গিয়ে বিক্ষোভ দেখান, তৎকালীন টাটা স্টীলের চেয়ারম্যান রুশী মোদীর বিমান অবতরণ না করতে পেরে ফিরে আসে। পরের দিন গুয়া বাজারে ৮ জন আদিবাসীকে হত্যা করা হয়।

পরিবেশ দূষণ

গুজরাটের মিঠাপুরে টাটা কেমিকালস থেকে ফেলে দেওয়া বর্জ্য একদিকে আশপাশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের ভৌমজলকে লবণাক্ত করেছে, যার ফলস্বরূপ কৃষকদের চাষের জমি নষ্ট হয়ে গেছে, অন্যদিকে তা সমুদ্রকে দূষিত করে কচ্ছের রান সামুদ্রিক ন্যাশনাল পার্কের বহু জীববৈচিত্র্যকে নষ্ট করে দিয়েছে। হায়দ্রাবাদের কাছে পতনচেরুতে টাটার অধীনস্থ সংস্থা র‍্যালিস ইন্ডিয়ার কীটনাশক কারখানা। সুপ্রীম কোর্টও এই কারখানাজাত বাষ্প ও বর্জ্যকে গোটা এলাকা বিষিয়ে তোলার জন্য দায়ী বলে চিহ্নিত করেছে। পতনচেরু পরিচিত হয়েছে পৃথিবীর নরক বলে। জামশেদপুরের যুগশলাইয়ের বয়লার অ্যাশের দূষণ, জোড়া মাইনসের লৌহ আকরিক খনির দূষণ, বোকারোর টাটার কয়লাখনির দূষণ—সবই মাত্রাছাড়া এবং বহাল তবিয়তে চলছে।

১৯৮৪তে ভোপালের ভয়ংকর গ্যাস ট্র্যাজেডির পর ইউনিয়ন কার্বাইডের চেয়ারম্যান ওয়ারেন অ্যান্ডারসনকে গ্রেপ্তার করা হলে হাতে গোনা যেকজন এই গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ করে, তার একজন হলেন জে আর ডি টাটা। উল্লেখ্য দুর্ঘটনার জন্য দায়ী যে নিকাশী ও অন্যান্য ব্যবস্থা, তার অনেকটাই তৈরী করেছিল টাটার ইঞ্জিনীয়াররা। ২০০৬-এ ডাও কেমিকালস ইউনিয়ন কার্বাইড অধিগ্রহণ করলে ভারত সরকার তাদেরকে ঐ বর্জ্য পরিষ্কারের জন্য ১০০ কোটি টাকা দিতে বললে, রতন টাটা ইউনিয়ন কার্বাইডকে দায়মুক্ত করার জন্য সালিশী করতে থাকেন, এবং ডাও-এর কারবার ভারতে সম্প্রসারিত করার বিশেষ উদ্যোগ নিয়ে ঐ বর্জ্য বিনা পারিশ্রমিকে পরিষ্কার করার কাজে নামে টাটা। ডাও তাদের ভয়াবহ দূষণের জন্য বিশ্বজুড়ে ধিকৃত, আর কি আশ্চর্য, তাদের আসার কথা ছিল নন্দীগ্রামের কেমিকাল হাবে।

শ্রমিকবিরোধী কার্যকলাপ

১৯৯১ থেকে রতন টাটা কর্ণধার হওয়ার পর টাটা গোষ্ঠীর কোম্পানী গুলিতে শুরু হয়েছে ব্যাপক শ্রমিক ছাঁটাই। ২০০৩-এ টাটা পাওয়ার কোম্পানীর কর্মী ইউনিয়নের দুজন শ্রমিক এর প্রতিবাদে টাটার হেডকোয়ার্টারের সামনে গায়ে আগুন দিয়ে আত্মহত্যা করেন।

মুম্বইয়ের সুতোকলগুলো ৮০-র দশকে এসে সংকটে পড়লে, টাটার মালিকানাধীন স্বদেশী মিল তার শিল্পজমির অর্ধেক বিক্রী করে দেয় এই বলে যে সেখানে নানা বিনোদন প্রকল্পের সাথে একটা কারখানাও হবে যাতে শ্রমিকদের কাজ দেওয়া হবে। জমি বিক্রী করে টাকা আত্মসাৎ করে টাটা, কিন্তু ঐ কারখানা আর হয়নি। এখানে কাজ হারান ২৮০০ শ্রমিক, আত্মহত্যা করেন অনেকে।

সামগ্রিকভাবে টাটা ব্যাপক ছাঁটাই, স্থায়ী কাজে ঠিকা নিয়োগ পলিসির দিকে ব্যাপকভাবে ঝুঁকেছে। ১৯৯৪ তে টাটার সমস্ত কারখানা মিলিয়ে যেখানে শ্রমিক ছিলেন ৭৮০০০, ২০০৬-এ এসে সেটা দাঁড়িয়েছে ৩৮০০০-এ। ২৫০০০ জনকে স্বেচ্ছাবসর করানো হয়েছে। টাটার স্কুলের শিক্ষকদের ভয় দেখানো হয়েছিল যে তারা যদি স্বেচ্ছাবসর না নেন, তাহলে তাঁদের রাস্তাপরিষ্কার করতে হবে।

শ্রমিক ইউনিয়ন বা শ্রমিক নেতৃত্বের ওপর আক্রমণের ব্যাপারেও পিছিয়ে নেই টাটা। ১৯৮৯ তে পুনেতে টাটার কারখানা টেলকোতে শ্রমিকরা মজুরীবৃদ্ধির দাবীতে লড়াইয়ে নামেন। রাতের অন্ধকারে ৩০০০ শ্রমিকের আমরণ অনশনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে পুলিশ ও অতিরিক্ত সেনাবাহিনী, ৮০টি বাসে করে শ্রমিকদের জেলে নিয়ে যাওয়া হয়। অতীতে টাটা ম্যানেজমেন্টের মদতে টাটা কারখানার দুজন ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠক আব্দুল বারি ও ভি জি গোপালকে হত্যা করার মত ঘটনাও তারা ঘটিয়েছে।

টাটা তুমি দূর হটো

আজ সিঙ্গুর বা কলিঙ্গনগরে টাটার থমকে যাওয়াটাই প্রথম ঘটনা নয়। ২০০০ সালে উড়িষ্যার রায়গড়ে বাপলিমালি পাহাড়ে বক্সাইট খনি, ঐ বছরই গোপালপুরে স্টীল প্ল্যান্ট গড়া থেকে পিছিয়ে আসতে হয় টাটাকে, উচ্ছেদ হতে চলা মানুষ জীবন দিয়ে প্রতিরোধ করে টাটাকে। ১৯৯৭ তে সিঙ্গিগাও, ৯০-এর দশকে চিল্কা থেকেও হাত গোটাতে হয়েছিল টাটাকে। সম্প্রতি তাদের বাংলাদেশ থেকে পশ্চাদপসরণের কাহিনীও আমাদের অজানা নয়।

‘বাম’ সরকারের জেলে শ্রমিকদের সাতাত্তর দিন

শংকর দাস

জেলের বন্দীদের কাছে পরমপ্রিয় শব্দ বোধহয়—রিলিজ। কাগজপত্তর এসে গেলে সন্ধ্যার লক-আপের ঠিক আগে আগে গেটের ছেলেটা লিস্ট হাতে নিয়ে হাঁক দেবে—‘হেই রি-লি-জ।’ অনেক আগে থেকে জামা-প্যান্ট পরে ব্যাগ-পত্তর গুছিয়ে বসে থাকা সেদিনের ভাগ্যবানেরা উজ্জ্বল মুখে গেটের দিকে দৌড় লাগাবে, এটাই দস্তুর। আমাদের কুড়ি জনের রিলিজের কাগজ এসে গেছে বেশ কিছুক্ষণ আগে। সাতাত্তর দিনের অধীর অপেক্ষার আজই শেষ। পরস্পর হাত ধরাধরি করে আরও জবরদস্ত লড়াই গড়ে তোলার শপথ নেওয়াও হয়ে গেছে। এখন চলছে অন্যান্য বন্দীদের সঙ্গে হাত মেলানোর পালা। কিন্তু কারুর চোখে-মুখেই মুক্তির আনন্দ নেই। কারুর মুখ কঠিন, কেউ কেউ নীরবে কাঁদছে। এক অদ্ভুত বিষাদ গ্রাস করেছে লড়াকু শ্রমিকদের। তাদের প্রিয় নেতা, সাথী, কমরেড অলিক চক্রবর্ত্তীকে ভেতরে রেখেই আমাদের বেরতে হচ্ছে। লুমটেক্স ইঞ্জিনিয়ারিং প্রাইভেট লিমিটেড বা চলতি কথায় মাঠকলে ম্যানেজার খুনের মামলায় ধৃত সর্বমোট একুশ জনের মধ্যে একমাত্র অলিকের জামিনই না-মঞ্জুর করেছে কলকাতা হাইকোর্ট। এদিকে সামনে ভেঙ্গে পড়া গোটা জেলবন্দীদের দঙ্গলটা একেবারে বেকুব বনে গেছে। এই পরিস্থিতিতে ঠিক কি করা উচিত তা কিছুতেই তাদের মাথায় আসছে না। নিজেদের পরমপ্রিয় দিনে অন্যের জন্য এই গভীর বিষাদ!— এ জিনিস তো তারা জীবনে দেখেনি। অবশ্য দেখেনি তো তারা অনেক কিছুই, যা দেখল এই লড়াকু শ্রমিকদের মধ্যে। ঘটনার শুরু প্রায় আড়াই মাস আগে যেদিন আমরা প্রথম ঢুকেছিলাম এই ব্যারাকপুর সাব জেলে।

জেলই আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়

রাজনৈতিক কর্মীদের কাছে জেল বোধহয় সবসময়ে একটা বিশ্ববিদ্যালয় হয়েই থাকবে। অন্যের মুখে শুনলেও বা বই-এ পড়লেও অনেক কিছুই তো আমরাও চোখের সামনে দেখিনি। বরাদ্দ মাংসের টুকরো থেকে কি উপায়ে শুধু হাড়টুকু রেখে বাকী মাংস খুবলে নেওয়া যায় বা বঁটি দিয়ে যত ছোট মাছের টুকরো যত পাতলা (চোখের সামনে ধরলে নাকি ওদিকটা দেখা যায়) করে কিভাবেই বা কাটা সম্ভব! সামান্য পয়সার অভাবে বা বিচার ব্যবস্থার গাফিলতিতে বছরের পর বছর কিভাবে জেলে বন্দী থাকে আসামীরা, আর তারাই আবার সদ্য আসা বন্দীদের ওপর কত রকম উপায়ে নির্যাতন চালায়—রক্তে-মাংসে এ সবই তো ছিল অজানা। নিজেদের ন্যায্য দাবী-দাওয়া নিয়ে লড়তে গিয়ে শ্রমিকরা গিয়ে পড়েছে এই অজানা আর প্রচণ্ড প্রতিকুল এক অবস্থায়। ‘জেল নরক কা এক হিস্যা হ্যায়’—চারদিকে তাকিয়ে এই হলো প্রথম উপলব্ধি।

কি অপরাধ এই শ্রমিকদের? কেন তাদের এই নরকবাস? দোষের মধ্যে বড় দোষ তারা করেছে, নিজেদের রক্ত-ঘাম দিয়ে রোজগার করা পয়সা থেকে কেটে নেওয়া প্রভিডেন্ট ফাণ্ড আর গ্র্যাচুইটির হিসাব তারা চেয়েছে। চল্লিশ বছর কারখানায় কাজ করার পর যেখানে কম করে পিএফ পাওয়ার কথা এক থেকে দেড় লক্ষ টাকা সেখানে কাউকে তিরিশ হাজার কাউকে চল্লিশ হাজার টাকা মালিক হাতে ধরিয়ে দিয়েছে। এরপর যখন গ্র্যাচুইটির টাকাও পাওয়া গেল না তখন তারা বাধ্য হল মাইনের অর্ধেক টাকায় অস্থায়ী মজুর হিসাবে কাজ করতে। বাড়িতে অভাব, তখনও শরীর নিয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে চলা এই শ্রমিকের দল তাদের পাওনা টাকার হিসাব চেয়েছে। কারখানার তরুণ শ্রমিকরা তাদের বাবা-কাকাদের এই অবস্থা দেখে বুঝেছে এখনই লড়াই না গড়ে তুললে ভবিষ্যতে তাদের অবস্থাও এই রকমই হবে। সুতরাং দালাল সমস্ত ইউনিয়নগুলিকে ত্যাগ করে শ্রমিকরা গড়ে তুলেছে তাদের নিজেদের ইউনিয়ন। সেই ইউনিয়নের নেতৃত্বে চলছে লড়াই। এই হলো তাদের দোষ। ব্যাস, এর পরে সেই চিরাচরিত হামলা। বাইরের গুণ্ডা লাগিয়ে সংগ্রামী ইউনিয়নের গেট-মিটিং আক্রমণ করা হল। তারপর ব্যাপক শ্রমিক রোষ এবং বিশৃঙ্খলার মধ্যে যখন পার্সোনাল ম্যানেজার খুন হল তখন সেই দায় চাপল লড়াকু শ্রমিকদের কাঁধে। ঝাঁপিয়ে পড়ল মালিক দরদী পুলিশ-প্রশাসন-সরকার। শ্রমিকদের ঠাঁই হলো জেলে। মাঠকলের শ্রমিকরা এই প্রথম বুঝল লড়াই-এ জিত আর তাদের মাঝখানে যা যা কিছু আছে তার মধ্যে একটা হলো এই জেল—‘নরক কা এক হিস্যা’।

সাব জেলগুলোতে টাকার খেলা চলে একথা কমবেশী সকলেরই জানা। কিন্তু তা যে কতটা সর্বাত্মক তা ভেতরে না থাকলে বিশ্বাস করা শক্ত। পুরনো কয়েদীদের কেউ কেউ এক একটা ঘরের দখল নিয়েছে। অবশ্য দখল নিয়েছে না বলে ‘লীজ’ নিয়েছে বলাই ভালো। কারণ এর জন্য তাদের মোটা অংকের পয়সা দিতে হয়েছে জেল প্রশাসনকে। এক একটি ঘরে তিরিশ-পঁয়ত্রিশ জন কয়েদী থাকে। সেখানে নিত্য আনাগোনা লেগে আছে। নতুন যারা এসেছে তাদের চাপ দিয়ে টাকা আদায় করা হয়ে থাকে। ‘বিনিয়োগ’ করা টাকার পরিমাণ চাপিয়ে যত খুশী টাকা কামাও। কেউ কিছু বলবে না। প্রথম রাত্তিরের এক নম্বর ঘরের অস্থায়ী আবাসে রাত কাটিয়ে পরের দিন বিকেলে আমরা জেল চত্বরে লাইন করে দাঁড়িয়ে আছি। সবার হাতে গুঁজে দেওয়া হয়েছে এক একটা চিরকুট। তাতে ঘরের নম্বর লেখা। কারুর ঠিকানা দুই নম্বর, কারুর তিন, কারুর বা সাত। ওদিকে তখন চত্বর এবং সেই সংলগ্ন নর্দমা পরিষ্কার করার ধুম পড়েছে। কোনো পারিবারিক ঝামেলায় জেলে এসেছে বাবা আর ছেলে। ছেলেকে দাঁড় করিয়ে রেখে ষাট -পঁয়ষট্টি বছরের বাবাকে দিয়ে কোন এক ঘরের পুরনো কয়েদিরা নর্দমা সাফাই করাচ্ছে। আর সঙ্গে চলছে অশ্রাব্য গালাগাল। বাবার অসহায় অবস্থা দেখে ছেলে যতই এগিয়ে এসে কাজ করতে চায় ততই তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেওয়া হয়। সঙ্গে জুটতে থাকে চড়-চাপাটি। আর বাবা-মা-ছেলে-ছেলের বৌ সবাইকে জড়িয়ে আরো ভয়ংকর গালিগালাজ। এরা জেলে এসেছে দুদিন হলো। এখনও টাকা দিতে পারেনি। সুতরাং চাপ বাড়াও। যত চাপ তত টাকা। এবং হাতে হাতে। জেল প্রশাসন এদিকে ঘুরেও তাকায় না। টাকায় সবারই ভাগ আছে। নিত্যদিন সকালে বাঙালিকে ‘অলস’, ‘নেতির সাধনাকার’ বলে গালাগালি দেওয়া আনন্দবাজারের সম্পাদক দেখলে খুশী হতেন যে বাঙালি কিভাবে লক্ষ্মীর সাধনায় মগ্ন হয়েছে! শ্রমিকরা আড়চোখে ওদিকে দেখছে আর শুকনো মুখে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে। কে জানে কে কেমন ঘরে গিয়ে পড়বে। সঙ্গের লোকগুলোই বা কেমন হবে। কিভাবেই বা পার করা যাবে এই নরকবাস—সবটাই তো অজানা আশঙ্কায় মোড়া।

সকাল ছটার ঘণ্টা পড়লেই তড়াক করে উঠে পড়ে নিজের নিজের বিছানা (গোটা তিন চারেক কম্বল পরপর পাতা) গুটিয়ে ঘরের এক কোণে রেখে সারি বেঁধে বসে পড়ো। এবার লকআপ খুলে যাবে। মেজবাবু বা ছোটবাবু এসে গুনতি করবেন। রাত্তিরে যতজনকে ঢুকিয়ে গেছিলেন ততজনই আছে কি না দেখে নিয়ে খাতায় সই করে চলে যাবেন। এরপর প্রাতঃকৃত্য ইত্যাদি করার জন্য দু-ঘণ্টা সময় দেওয়া হবে। আটটার সময় আবার লকআপ। তার আগে আবার গুনতি। দশটার থেকে বারোটা স্নান করার সময়। বারোটা থেকে তিনটে আবার লকআপ। তিনটে থেকে ছটা অবধি চত্বরে হাঁটাচলা। ছটায় আবার লকআপ। এই হলো জেলের রুটিন। তিনটে থেকে ছটা এই সময়টায় জেলের পেছন দিকটায় রান্নাঘরের পাশে গোল হয়ে আমাদের আড্ডা বসেছে। লোকে দেখছে অবাক হয়ে। একবার জেলে এসে পড়লে একই কেসের আসামীদের মধ্যে তেমন আর সম্পর্ক থাকে না। যে যার নিজের ধান্দায় লেগে যাও—এই আর কি। কথা হচ্ছে জেলের খাওয়া নিয়ে। সকালে সামান্য শুকনো মুড়ি। দুপুরে এক কৌটো ভাত আর ডাল তরকারি। রাতে পাঁচটা রুটি আর তরকারি। একেই খাবার অপ্রতুল। তার ওপর গলা দিয়ে নামানো বেশ কষ্টকর ব্যাপার। গত পনেরো দিন যাবৎ আমরা খেয়ে যাচ্ছি, কুমড়োর তরকারি। খোসা সুদ্ধ কুমরোর টুকরো জলে একটু হলুদ আর নুন দিয়ে ফুটিয়ে দেওয়া আর সঙ্গে পাতলা ডাল। সোমবার এর সঙ্গে উপরি পাওয়া যাবে একটুকরো মাংসের হাড় আর শুক্রবার এক পিস (পূর্ব বর্ণিত) মাছ। আমরা জেলে ঢোকার তিরিশ দিনের মাথায় মঙ্গলবার করে একটা ডিমসেদ্ধ দেওয়া শুরু হয়েছিল। গ্রেপ্তার হওয়া শ্রমিকদের অধিকাংশই রাজনৈতিক কর্মী নয় যে, সমস্ত প্রতিকূলতা আগে থেকে ভেবে সেই মতো মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে নেবে। একেই দুর্বিষহ বন্দী জীবন তার ওপর দিনের পর দিন অসহ্য খেয়ে চলার কষ্ট সবার ওপরেই এক প্রবল চাপ তৈরি করেছে। আমাদের সঙ্গে ধরা পড়েছেন সত্তর বছর বয়সী ভগৎজি। রিটায়ার করার পর পি.এফ.-এর নামে বিয়াল্লিশ হাজার টাকা পেয়েছিলেন। মেয়ের বিয়েতে খরচা হয়ে গেছে। তারপর থেকে দৈনিক একশ টাকার মজুরীতে খেটে চলেছেন। প্রথম থেকেই লড়াইয়ে আছেন। গেট মিটিং আক্রমণ করতে এসে গুণ্ডারা পায়ে লাঠি চালিয়েছিল। ধীরে ধীরে যে যন্ত্রণা সামলে উঠেছিলেন। কিন্তু খাওয়ার কথা উঠতেই প্রায় কেঁদে ফেললেন। ‘আমরা গরীব হতে পারি, কিন্তু এরকম...’। তার গলা আটকে যায়। এদিকে জেলে এসেই আমরা জেনেছি যে সরকারি বরাদ্দ প্রতিদিন প্রতি বন্দী পিছু ৫২ টাকা ৫০ পয়সা। তাতে তো এলাহি খাওয়া-দাওয়া সম্ভব। হিসাব করলে আমরা প্রতিদিন ১৫ টাকার খাবারও পাই না। বাকি পয়সা নিয়ে দেদার দুর্নীতি চলছে। দুর্নীতির বিকেন্দ্রীকরণ ঘটিয়ে কিছু লোককে সঙ্গে রাখাও যাচ্ছে। বত্রিশ বছরের ‘বাম’ শাসনে এ জিনিস তো সর্বত্র। আর তাছাড়া জেলে এসে ভালোভাবে খাওয়া-থাকা গেলে ট্যা-ফোঁ করলে ওয়ালাদের টাইট-ই বা দেওয়া যাবে কি করে? এক ঢিলে কতগুলো পাখি দেখুন। সরকারের ভালোমানুষী দেখানোও হলো। দুর্নীতি করতে দিয়ে কিছু লোককে সঙ্গে রাখাও গেলো। আবার ট্যা-ফোঁ করনেওয়ালাদের টাইট দেওয়াও গেলো। কিন্তু লড়াকু শ্রমিকদের টাইট দ্যেয়া কঠিন কাজ। রোজ খোসা সমেত কুমো খেয়েই তারা লড়াই জারী রাখার প্রতিজ্ঞা করে বসে। সাধারণ সময়ে লড়াইয়ের কথা বলা সহজ কাজ। কিন্তু প্রবল চাপের মুখে দাঁড়িয়ে দৃঢ়তা বজায় রাখা? জেল সেই ট্রেনিং রোজ একটু একটু করে দিতে থাকল। জেল সত্যিই এক বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে সমস্ত রাত জেগে লড়াকু মানুষ নতুন করে পড়ে জন্মভূমির বর্ণপরিচয়।

বাইরে তখন বক্ষে বৃক্ষে/স্থলে জলে অন্তরীক্ষে

বাইরে তখন শুরু হয়ে গেছে এক ধুন্ধুমার অসম লড়াই। মিল খোলার দাবিতে এবং গ্রেপ্তার করা শ্রমিকদের মুক্তির দাবিতে ইউনিয়নের বাকি নেতৃত্বের অধীনে এক তীব্র লড়াই গড়ে উঠেছে। এতদিন যারা লড়াইয়ে পেছনে ছিল আগুয়ান লোকেরা গ্রেপ্তার হয়ে যাওয়াতে যে ফাঁকা জমি তৈরি হলো তা ভরাট করতে তারা জান কবুল করে এগিয়ে এল। চারদিকের চোরাগোপ্তা শাসানি, থানা-পুলিশের চাপ আর অভাবের জ্বালা অগ্রাহ্য করে সাধারণ মানুষগুলো কেমন যেন অসাধারণ হয়ে উঠতে থাকল। ইতিমধ্যে আমাদের পথবন্ধুরা পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। সুদূর চেন্নাই বা দিল্লী থেকেও টাকা পাঠাচ্ছে কেউ কেউ। মিটিং-মিছিল-ডেপুটেশন-ধর্না আর সঙ্গে চলছে আইনী লড়াই।। মালিক-ম্যানেজমেন্টও চুপ করে বসে নেই। চটকলের মালিকরাও দল বেঁধে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধ ভট্টাচার্যের সঙ্গে দেকা করেছেন। কারখানা কারখানায় সীমাহীন শোষণ-নিষ্পেষণ চালানোতে বাগড়া দিচ্ছে যে বদমাশ শ্রমিক আর তাদের সংগ্রামী নেতৃত্ব তাদের বিরুদ্ধে জোরদার ব্যবস্থা নেওয়ার আর্জি জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে। শিল্পপতি বান্ধব মুখ্যমন্ত্রীও সহানুভূতির সঙ্গে তাদের যথাসম্ভব সাহায্য করছেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সীমান্তের দুই দিকে দুই পক্ষেরই সাধ্যমত শক্তি সমাবেশ আর সেই লড়াইয়ের খবর জেলসাক্ষাতের ঘুলঘুলি দিয়ে ছিটকে আসছে ভেতরে। সবাই অধীর আগ্রহে খবরের অপেক্ষা করে। আর খবর আসলেই তিনটের পর জেলচত্ত্বরে আমাদের নির্দিষ্ট জায়গায় গোল হয়ে মিটিং-এ বসে। কখনও তীব্র বিতর্ক, কখনও শুধুই নীরবতা কখনও বা উচ্চহাসি আর উল্লাসে যে মিটিং জীবন্ত হয়ে ওঠে।

এমনই এক দিনে আমাদের ঘরে পুরনো কয়েদীদের খাবার আনা বা গা-হাত-পা টিপে দেওয়ার কাজ করে যে ছেলেটা যে সসম্ভ্রমে বলল— ‘আপনাদের তো দাদা ব্যাপারই আলাদা। ভেতরে বাইরে সবাই একসঙ্গে আছেন। আমাদের অবস্থা দেখুন। আমার জামিন হয়ে গেছে ৫৬ দিন আগে। একশ টাকা দিতে পারছি না বলে বেরতে পারছি না। বাড়িতে শুধু মা আছে। চোখেই দেখতে পায় না। কেউ দেখা করতেও আসে না। দাদাদের খুশী করার চেষ্টা করে যাচ্ছি। কোনদিন যদি দয়া করে একশ টাকা দেয় তাহলে বেরতে পারব।’ ওর কথা শুনে আশ্চর্য লাগে। ভাল করে তাকিয়ে দেখি। এতদিন আমরা নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত দিলাম। অন্য বন্দীদের দিকে তাকানোর তেমন সুযোগ হয়নি। আস্তে আস্তে পরিয়ে হতে থাকে। আর এতদিনে অন্যরাও জেনে গেছে যে এই শ্রমিকদের দলটা অন্য অপরাধীদের মতো নয়। এদের ‘অপরাধ’টা একটু আলাদা গোছের। এদের ভাবনা-চিন্তা, কর্মপদ্ধতিও আলাদা। আন্তরিকভাবে সবাই তাদের সমস্যা জানায়। ধীরে ধীরে আমাদের এই ‘মহান’ গণতন্ত্রের বিচার ব্যবস্থার ছবিটা রক্তে-মাংসে জীবন্ত হয়ে ওঠে। পুলিশের খাতায় কোন কারণে একবার নাম উঠে গেলে আর রক্ষে নেই। এলাকায় কোন অপরাধ ঘটলে যদি আসল অপরাধীদের পাওয়া গেল তো গেল। আর যদি তাদের না পাওয়া যায় বা শাসকদলের ছত্রছায়ায় থাকার ফলে যদি গ্রেপ্তার করা না যায় তাহলে পুরনো খাতা থেকে নাম খুঁজে পুলিস থাকে তাকে ধরে নিয়ে আসে। সংবাদপত্রে পরের দিন ঘটনার বিবরণ ছাপা হয় আর শেষে লেখা হয় ‘পুলিশ অপরাধী সন্দেহে অমুক অমুককে গ্রেপ্তার করেছে’। সেই খবর পড়ে দেশের সুনাগরিকরা আশ্বস্ত হন। সরকারকে কর দেওয়া বিফলে যাচ্ছে না। আসল অপরাধীরা দেখা যাবে হয়ত বহাল তবিয়তেই আছে। এদিকে বার বার জেলে আসা যাওয়ায় অভ্যস্ত হয়ে কত অল্প বয়সী অরুণরা ধীরে ধীরে সত্যিকারের অপরাধী হয়ে উঠছে যে খবর অবশ্য কোনো সংবাদপত্রেই ছাপা হয় না। ‘বাম’ সরকার জেলের নাম পাল্টে নাম রেখেছে ‘সংশোধনাগার’। বুঝুন, কি বিচিত্র পরিহাস! একবার জেলে এসে ঢুকলে সহজে বেরনো মুস্কিল। নিম্ন আদালতে মামলার পাহাড় জমছে। বিচারপতিদের অত কিছু শোনা বা দেখার সময়ও নেই, সেই পরিকাঠামোও নেই। স্বাভাবিকভাবেই তারিখের পর তারিখ পার হয়ে যায়। জামিনযোগ্য মামলাগুলিতেও জামিন পেতে বহু সময় লেগে যায়। মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি করার জন্য সরকার তৈরি করেছিল ফাস্ট ট্র্যাক আদালত। এই গালভরা নামের অর্থ হলো মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি হবে এমন আদালত। কিন্তু আসলে হচ্ছেটা কি? খুন, ধর্ষণ, ডাকাতি এই ধরনের ভারী মামলায় পুলিশ দ্রুত চার্জসিট দিয়ে দিচ্ছে। আর একবার চার্জশিট দিয়ে দিলে সাধারণত মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত জেলেই থাকতে হয়। চার্জশিট না দিতে পারলে নব্বুই দিনে জামিন পাওয়া যায়। কিন্তু পুলিশ যত দ্রুততায় চার্জশিট দেয় এর পরের বিচারপদ্ধতি ততটাই ধীর গতিতে চলতে থাকে। মামলা যতদিন নিম্ন আদালতে থাকে ততদিন প্রতি ১৪ দিনে মামলা একবার আদালতে ওঠে। কিন্তু চার্জশিট দাখিল করার পরে মামলা সেই সেশন কোর্টে উঠল তখন এক একটি তারিখ পেতে তিন-চার মাস সময় লেগে যায়। ধরুন কোনো খুনের মামলায় ১০ জন সাক্ষী আছে। আর গড়ে এক একটি তারিখ পেতে যদি তিনমাস লাগে তাহলে শুধুমাত্র সাক্ষ্যগ্রহণ পর্ব সমাধা করতেই তিরিশ মাস লেগে যাবে। এমন ঘটনাও দেখলাম যে সাক্ষ্যগ্রহণ পর্ব মিটে যাওয়ার পর বিচারপতি শুধু রায় শোনানোর জন্যই ১৪টা তারিখ নিয়েছেন। আজ প্রতিটি তারিখের ব্যবধান গড়ে দুই মাস। আর এরকম দীর্ঘ মামলা চলার পর (আসামী কিন্তু জেলে বন্দী) আসামীকে বেকসুর খালাস ঘোষণা করাও বিরল নয়। বরং তা আকছার ঘটছে। সুতরাং ফাস্ট ট্র্যাক আদালত বা মামলার দ্রুত নিষ্পত্তির নাম করে আসলে পুলিশের হাতে সরকার এখন এক অপরিসীম ক্ষমতা তুলে দিয়েছে। কোন মামলায় ফাঁসিয়ে দিয়ে যে কাউকে তিন চার বছর বা তার বেশি সময় জেলে আটকে রাখাটা পুলিশের কাছে এখন জলভাত। ফাস্ট ট্র্যাক আদালতের নামে আসলে চলছে জেলে বন্দী রেখে বিচার চালাবার (কাষ্টডি ট্রায়ালে) ব্যবস্থা। সমাজ জুড়ে শাসকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম যত বাড়বে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের আপাত গণতান্ত্রিক মুখোশ ছিঁড়ে ফেলে তার কদর্য রূপ ততই আত্মপ্রকাশ করবে এটা একেবারেই অবধারিত।

তোমারে বধিবে যে/ তোমারই কারায় বাড়িছে সে

জেল থেকে বেরিয়ে আসব বলে অন্যদের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছি। একজন হাত না মিলিয়ে মুষ্টিবদ্ধ হাত কাঁধের ওপর তুলে লাল সেলাম জানাল। বাড়িয়ে দেওয়া হাত গুটিয়ে নিয়ে সচকিতে তাকে পাল্টা লালসেলাম জানিয়ে জড়িয়ে ধরি। বেরনোর তাড়ায় অবশ্য তাকে আর জিজ্ঞাসা করা হল না যে লাল সেলাম জানানোর এই ভঙ্গীটি যে কোথায় লিখেছে। কিন্তু এই সাতাত্তর দিনে লড়াকু শ্রমিকদের এই দলটা জেলের ভেতর তাদের অনুগামীদের সংখ্যা বাড়িয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। ইতিমধ্যে বাইরে থেকে স্লোগান ভেসে আসছে। সেশান কোর্ট ফেরৎ যে বন্দীরা জেলে এসে ঢুকছে তারা উজ্জ্বল উত্তেজিত মুখে জানাল—‘বাইরে আপনাদের অনেক লোক এসেছে’। হঠাৎ করেই জেলের দেওয়ালটাকে কেমন পাতলা আর ঠুনকো মনে হতে থাকল। ভেতরের বাইরের মানুষ্যের আবেগ সংগ্রামের কোন ত্রিবেণী সঙ্গমে মিলছে কে জানে। কিন্তু মাঠকলের শ্রমিকদের লড়াই শ্রমিক আন্দোলনের মরা গাঙ্গে বান আনার যে পূর্বাভাস গত বেশ কয়েক বছর যাবৎ চলছে তাকেই জোরদার করে তুললো। গড়ে উঠছে সংগ্রাম এবং নতুন সংগঠন। লড়াকু শ্রমিকরা সেই লড়াইয়ের প্রস্তুতি চালাচ্ছে। মার্কস-এঙ্গেলসদের সারা জীবনের সংগ্রাম আর আত্মত্যাগ বৃথা যাবে না। লড়াকু শ্রমিকরা সংখ্যায় বাড়ছে। একদিন সত্যিই তারা জিতে নেবে গোটা দুনিয়া।

ঘোড়া কেনাবেচার পরিপ্রেক্ষিতে আগামী লোকসভা নির্বাচন

অমৃত পৌড়া

কয়েক কোটি টাকা খরচ করে কয়েকজন সাংসদকে কিনে নিয়ে এ যাত্রা টিকে গেল মনমোহন সিং সরকার। এমনকি বিজেপি-র কয়েকজন সাংসদকেও নাকি টাকা দেওয়া হয়েছিল। সেইসব সাংসদরা সংসদের ভেতরেই নোটের বাণ্ডিল দেখিয়েছেন। ঘোড়া কেনাবেচায় ময়দানে নেমেছিলেন সমাজবাদী পার্টির নেতা অমর সিং। টাকা জুগিয়েছে আম্বানিরা। আম্বানিদের সঙ্গে কংগ্রেস দল বিশেষ করে প্রণব মুখার্জীর সখ্যতার কথা কে না জানে। বস্তুতঃ ধীরুভাই আম্বানির উত্থানের মূলে তো এই প্রণব মুখার্জীই রয়েছেন। আম্বানিদের সঙ্গে সমাজবাদী পার্টি বিশেষত তাদের নেতা অমর সিং-এর ঘনিষ্ঠতাটাও আমাদের সকলেরই জানা।

তবে পুঁজিপতিদের বা শাসকদলের নেতাদের সম্পর্কগুলো তো সাধারণ মানুষের মতো খুব আবেগ-টাবেগ থেকে তৈরি হয় না। সবই লেনদেনের সম্পর্ক। আম্বানিরা যেমন সাংসদ কেনার টাকা দিলেন তার বিনিময়ে পেলেন কি? পেলেন সারাদেশের শ্রমিক-কর্মচারীদের পেনশন প্রকল্পে জমা থাকা ৩০,০০০ কোটি টাকা প্রাইভেট ক্ষেত্রে বিনিয়োগের তথা নয়ছয় করার ছাড়পত্র। আই.সি.আই.সি.আই এবং এইচ.এস.বি.সি. ব্যাঙ্কের সঙ্গে একযোগে রিলায়েন্স ক্যাপিটাল (আম্বানিদের কোম্পানী) এই ছাড়পত্র পেল। আস্থাভোট তখন সবে শেষ হয়েছে, সংবাদমাধ্যম তখনও এই ভোটের অঙ্ক নিয়ে নানারকম কাটাছেঁড়া করছে সেই ডামাডোলের মধ্যেই তড়িঘড়ি প্রধানমন্ত্রী এই সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করে দিলেন। মনমোহন সিং-এর গদি রক্ষার জন্য দেশের লক্ষ লক্ষ শ্রমিক কর্মচারীকে খেসারত দিতে হল।

প্রধান বিরোধী দল বিজেপি নীতিগতভাবে পরমাণু চুক্তির বিরুদ্ধে নয়। এনডিএ-র অনেক শরিক দলও এই চুক্তির পক্ষে। হবে নাই বা কেন। এরা সকলেই পুঁজিবাদী দল এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অনুগত। কিন্তু কংগ্রেস-সিপিএম-এর সাময়িক দূরত্বকে কাজে লাগিয়ে যদি মনমোহন সিং সরকারকে ফেলে দেওয়া যায় তাহলে তারা রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে পারবে। এই আশায় তারা কোমর কষে আস্থা ভোটে মনমোহন সিং-দের বিরুদ্ধে সমস্ত বিরোধী ভোটকে সংগঠিত করতে নেমে পড়ল। কিন্তু বাঘের ঘরে যে ঘোগের বাসা হয়ে আছে তা আদবানীর মতো বিচক্ষণ নেতাও বুঝতে পারেননি।

আসলে আস্থা ভোটের গোটা নাটকটাকে অন্য মাত্রায় নিয়ে যান প্রকাশ কারাতের নতুন বান্ধবী 'দলিতরানী' মায়াবতী। সম্প্রতি মায়াবতীর দল বহুজন সমাজ পার্টির উত্থান ভারতের প্রধান প্রধান শাসকদলগুলির হৃদকম্প ধরিয়ে দিয়েছে। মায়াবতীও প্রধানমন্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন দেখা শুরু করেছেন। কেরালায় অন্তর্দ্বন্দ্বে দীর্ণ, পশ্চিমবঙ্গে ক্রমশঃ জনপ্রিয়তা হারানো সিপিএম, তিনটি রাজ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে যাওয়া সিপিএমও তাই সর্বভারতীয় রাজনীতিতে নতুন সমীকরণ খুঁজছে। তাই প্রকাশ কারাতও মায়াবতীর প্রধানমন্ত্রিত্বের স্বপ্নকে উস্কে দিয়ে গত নির্বাচনের সাংসদ সংখ্যাটাকে ধরে রাখা যায় কি না সেই চেষ্টায় রয়েছেন।

একদিকে জোট ভাঙা-গড়ার খেলা, অন্যদিকে মূল্য বৃদ্ধি, পরমাণু চুক্তি, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের রণনৈতিক পার্টনার হয়ে যাওয়া, সেজ প্রকল্প তৈরি করা, হাজার হাজার একর কৃষিজমি কৃষকদের কাছ থেকে জোর করে কেড়ে নেওয়া, খুচরো ব্যবসায় দেশী বিদেশী বহুজাতিক কোম্পানীগুলোকে অবাধ ছাড়পত্র দেওয়া, দেশের কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বীমাক্ষেত্র সমস্ত জায়গায় দেশী বিদেশী বড় বড় পুঁজিপতিদের অবাধ মুনাফা লুণ্ঠনের বন্দোবস্ত করে দেওয়া—এসব কিন্তু চলছে। সেটা এনডিএ সরকারের আমলেও চলেছে, ইউপিএ সরকারের আমলেও চলছে। সেটা সিপিএম শাসিত রাজ্যেও চলছে, আবার বহুজন সমাজপার্টি শাসিত রাজ্যেও অবাধে চলছে। আবার জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে কিম্বা শাসকদের অন্যান্য জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন যখন ফেটে পড়ছে তখন ভোটের স্বার্থে ধান্দাবাজ দলগুলো ঢুকে পড়ছে এবং মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। বিজেপির পশ্চিমবঙ্গে এক রূপ আবার গুজরাটে অন্য রূপ। সিপিএম-এর ওড়িশায় পস্কো বিরোধী আন্দোলনে এক রূপ আর সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের রূপ তো আমরা দেখছিই। যে কংগ্রেস দল কেন্দ্রে ক্ষমতায় থেকে সেজ থেকে শুরু করে পরমাণু চুক্তি, পেনশন বিল ইত্যাদি জনবিরোধী পদক্ষেপ গ্রহণ করছে তারাই আবার সিঙ্গুর নিয়ে শিরা ফোলাচ্ছে।

আসলে শাসকদলগুলো তাদের ভোটব্যাঙ্ক ধরে রাখার জন্যই এধরনের দ্বিচারিতা চালিয়ে যায়। এই নিয়েই তারা আগামী লোকসভা নির্বাচনেও নানারকম জোট গড়ে, প্রতারণার নানারকম উপকরণ সাজিয়ে তারা মানুষের ভোট চাইবে। মানুষ যাতে তাদের পাঁচ বছর ধরে ক্ষমতায় থাকার ছাড়পত্র দেন এটাই তাদের একমাত্র লক্ষ্য। কিন্তু মানুষের প্রতি তাদের কোন দায়বদ্ধতা নেই। তাদের যা কিছু দায়বদ্ধতা পুঁজিপতিদের কাছে, সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে। আর সেটাকেই তারা দেশের প্রতি দায়বদ্ধতা বলে মানুষকে ভুল বোঝায়। দেশের স্বার্থেই নাকি মনমোহন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে পরমাণু চুক্তি করেছেন, অন্ততঃ কেন্দ্রীয় সরকার সেভাবেই প্রচার করছে। ঠিক যেমনভাবে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যরা আমাদের বুঝিয়ে চলেছে টাটা-সালিমদের মুনাফার ক্ষেত্র তৈরি করাটাই আমাদের উন্নয়ন।

প্রশ্নটা হল জনগণ কি শুধু প্রতারিত হয়েই যাবেন? আজ কি সময় হয়নি প্রশ্ন তোলার, ঘুরে দাঁড়ানোর?

কলকাতায় বাউড়িয়া কটন শ্রমিকদের বিক্ষোভ

১ পৃষ্ঠার শেষাংশ

ইউনিয়ন করে চলেছে। অন্যান্য দলীয় ইউনিয়নগুলির বিরোধিতা, প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যদের পদত্যাগ, মালিক পক্ষের অনুপস্থিতি এবং পি.এফ. দপ্তরের উদ্যোগহীনতা দাবি আদায় অসম্ভব করে তোলে। সংগ্রামী শ্রমিক ইউনিয়ন আওয়াজ তোলে যে, কেন্দ্র সরকারকে কারখানার প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের ট্রাস্টি বোর্ড বাতিল করতে হবে যাতে করে শ্রমিকদের পি.এফ.-এর টাকা পাওয়া সম্ভব হয়। এই দাবি নিয়ে হাওড়া জেলা পি.এফ. দপ্তর থেকে শুরু করে দিল্লীর কেন্দ্রীয় পি.এফ. দপ্তর পর্যন্ত শ্রমিকদের দাবি পেশ করে লড়াই শুরু হয়। ২০০৭ সালের বার্ষিক সাধারণ সভায় সংগ্রামী শ্রমিক ইউনিয়ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে পি.এফ.-এর টাকা আদায় করবার জন্য একমুখীভাবে লাগাতার আন্দোলন চালানো হবে। এরই ধারাবাহিকতায় গত বছরের মার্চ মাস থেকে শ্রমিকরা লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে যায়। হাওড়ার পি.এফ. দপ্তরে শুরু হয় লাগাতার বিক্ষোভ-অবস্থান। গত বছরের ২ অক্টোবর বাউড়িয়ার রাজশ্রী হলে নাগরিক কনভেনশনের মাধ্যমে ১৭ ডিসেম্বর (২০০৭) পি.এফ. দপ্তরে অনির্দিষ্টকালীন অবস্থান কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। চাপের মুখে পি.এফ. দপ্তর পিছু হটে এবং কর্মসূচি স্থগিত রাখার অনুরোধ জানিয়ে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করার প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু আবারো পি.এফ. দপ্তর দীর্ঘসূত্রিতার পথে হাঁটতে থাকে। গত ১৯ জুন সংগ্রামী শ্রমিক ইউনিয়ন কোন নোটিশ ছাড়াই আচমকা হাওড়ার পি.এফ. দপ্তরে তীব্র বিক্ষোভ জানায়। পি.এফ. দপ্তর শ্রমিকদের দাবি মতো বাউড়িয়া কটন মিলের ট্রাস্টি বোর্ডকে বাতিল ঘোষণা করে চিঠি পাঠায়। কিন্তু পঃবঙ্গ সরকারের অনুমোদনের অভাবে এই কাজ মাঝপথে থমকে যায়, ফলে শ্রমিকদের পি.এফ.-এর টাকা পাওয়ার বিষয়টা অনিশ্চিত হয়ে পরে। এই অনিশ্চয়তাকে দূর করতে, ট্রাস্টি বোর্ড বাতিল করার জন্য রাজ্য সরকারের প্রয়োজনীয় অনুমোদনের দাবিকে আদায় করতেই গত ১১ আগস্ট বাউড়িয়া কটনের শ্রমিকরা রাজ্য সরকার-এর বিরুদ্ধে জমায়েতে সামিল হয়।

এই বিক্ষোভ সমাবেশে সভাপতি হন বাউড়িয়া কটনের শ্রমিক শেখ মতি। সভায় বহু বাউড়িয়া কটন মিলের শ্রমিক, শ্রমিক পরিবার ছাড়াও কানোরিয়া জুট, হিন্দমোটর প্রভৃতি কারখানার শ্রমিকেরাও এই সভায় উপস্থিত থাকেন। হিন্দমোটর সংগ্রামী শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের পক্ষে আভাস মুন্সী, লুমটেক্স সংগ্রামী মজদুর ইউনিয়নের পক্ষে শঙ্কর দাস, বাউড়িয়া কটন সংগ্রামী শ্রমিক ইউনিয়ন-এর পক্ষে কুশল দেবনাথ প্রভৃতি বক্তা সভায় আন্দোলনের পক্ষে বক্তব্য রাখেন। তিনজনের একটি প্রতিনিধি দল লিখিত বক্তব্য নিয়ে দেখা করে শ্রম সচিবের সাথে। লাগাতার আন্দোলন, বড় শ্রমিক জমায়েত ও আন্দোলনের ন্যায্যতা সরকারের উপর শাসক চাপ সৃষ্টি করে। ফলে রাজ্য সরকার প্রয়োজনীয় অনুমোদন দেবার ন্যায্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়। লাগাতার আন্দোলনের মধ্য দিয়েই বাউড়িয়া কটনের শ্রমিকরা তাদের দাবি মিটিয়ে আনার পথে সাফল্য অর্জন করতে চলেছে। ধারাবাহিক, আপোষহীন সংগ্রামই যে শ্রমিক আন্দোলনের সাফল্য এনে দিতে পারে, বাউড়িয়া কটনের সংগ্রাম তাই প্রমাণ

টিটাগড় মাঠকলে শ্রমিকদের ৭২ ঘন্টা অনশন

১ পৃষ্ঠার শেষাংশ

মালিকপক্ষ চাইছে সংগ্রামী মজদুর ইউনিয়নের সমস্ত লড়াকু শ্রমিককে ছাঁটাই করার শর্তে মিল খুলতে। মিল খোলার জন্য মালিকপক্ষের শর্ত হল— ৪২ জন শ্রমিক গেটের ভিতরে ঢুকতে পারবে না, উৎপাদনভিত্তিক বেতনকাঠামো হবে, পিএফ, গ্র্যাচুইটির দাবী তোলা যাবে না, বাইরের শ্রমিক নেতারা কারখানার আধ কিলোমিটারের মধ্যে আসতে পারবে না প্রভৃতি। অর্থাৎ, এককথায় নির্লজ্জ ভাবে একটা বিশেষ ইউনিয়নকে নির্মূল করার কার্যক্রম নিয়েছে মালিকপক্ষ, কারণ শ্রমিকরা ক্রমশঃ ঐক্যবদ্ধ হয়েছে ঐ লড়াকু ইউনিয়নের পতাকাতলে। অন্য ইউনিয়নগুলি, যারা তাদের ভূমিকার জন্য ইতিমধ্যেই শ্রমিকদের মধ্যে তাদের ভিত্তি হারিয়েছে, তারা শ্রমিকদের অসহায়তা-অনাহারের সুযোগ নিয়ে ঐ কালা শর্তেই মিল খোলা হোক বলে গোপনে প্রচার করার চেষ্টা করছে।

সংগ্রামী মজদুর ইউনিয়নের পক্ষ থেকে গত ২৭-৩০ আগস্ট ছোটা গান্ধী মোড়ে নিঃশর্তে মিল খোলার দাবীতে ৭২ ঘন্টা অনশন করেন সাত জন শ্রমিক ও সহযোগী। অঞ্চলের ও অন্যান্য জেলার নানা কারখানার শ্রমিকরা এসে সংহতি জ্ঞাপন করেন এই ন্যায্য লড়াইয়ে।

মেকী স্বাধীনতার বিরুদ্ধে বহরমপুরে অবস্থান বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি: অন্যান্য জেলার মতো মুর্শিদাবাদ জেলা মজদুর ক্রান্তি পরিষদের উদ্যোগে বহরমপুরের জনবহুল গীর্জার মোড়ে গত ১৫ আগস্ট দুপুর তিনটে থেকে সন্ধে সাতটা পর্যন্ত অবস্থান বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন বক্তা স্বাধীনতার প্রকৃত স্বরূপ তুলে ধরেন। আজও ভারতে কেমনভাবে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ চলছে এবং কারা সাম্রাজ্যবাদকে সে কাজে সাহায্য করছে সে সম্পর্কে বক্তারা আলোচনা করেন।

ভয়াবহ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি 'দাসত্বের সনদ' আমেরিকার সঙ্গে পরমাণু চুক্তি ও খুচরো ব্যবসায় বৃহৎ পুঁজিপতিদের অনুপ্রবেশ ইত্যাদির বিরুদ্ধে প্রতিবাদের জন্য ২৬ আগস্ট মজদুর ক্রান্তি পরিষদের পক্ষ থেকে কলকাতায় যে গণ আইন অমান্য আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়েছে তাতে জনসাধারণকে সামিল হতে বক্তারা আহ্বান জানান।

সভায় বক্তব্য রাখেন জেলা সম্পাদক কমরেড বুদ্ধদেব মণ্ডল, কমঃ গোকুল হাজরা এবং সুভাষ পাণ্ডে। আমন্ত্রিত বক্তা হিসাবে অবস্থানকে সমর্থন করে বক্তব্য রাখেন এস.ইউ.সি.-র পক্ষে কমঃ গৌতম সাহা, সিপিআইএমএল লিবারেশন-এর পক্ষ থেকে কমঃ তপন ভট্টাচার্য ও শঙ্খ গুপ্ত এবং সংযুক্ত মজদুর সংগ্রাম সমিতির পক্ষে কমঃ কাবিল সেখ। সভায় সভাপতিত্ব করেন কমঃ সুভাষ পাণ্ডে।

মহারাষ্ট্রে আরও এক ধাপ এগলো ডাও কেমিক্যালস্ বিরোধী সংগ্রাম

প্রদীপ রায়: পুনা শহর থেকে ৩০ কিলোমিটার দূরত্বে বাসুলি ও শিণ্ডে গ্রামে কুখ্যাত বহুজাতিক কোম্পানি ডাও কেমিকালস্-এর ১০০ একর জমিতে প্রস্তাবিত রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান্টকে ঘিরে গত আট মাস ধরে বিক্ষোভ ধূমায়িত হচ্ছে। গ্রামের সর্বসাধারনের ব্যবহারের জমি দখল এবং এলাকার কৃষিজমি ও নদী দূষণের আশঙ্কাতেই সাধারণ মানুষের এই স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ। লোকশাসন আন্দোলন ও যুব ভারত সংগঠনের উদ্যোগে সেখানে গড়ে উঠেছে 'ভীমচন্দ্র ডোঙ্গার বাঁচাও ওয়ার্কারি শ্বেতকারী সংঘর্ষ সমিতি।' কৃষক ও ওয়ার্কারি সম্প্রদায়ের মানুষেরা এই বছরের জানুয়ারি মাসেই ডাও কেমিক্যালস্-এর প্রস্তাবিত প্ল্যান্টের নির্মাণকার্য বন্ধ করে দেয়। এরপর সাত মাস ধরে চলে ডাও বিরোধী, মহারাষ্ট্র রাজ্য সরকার বিরোধী লাগাতার বিক্ষোভমূলক নানা কর্মসূচী। রাজ্য সরকার পুলিশ-প্রশাসন দিয়ে, অত্যাচার চালিয়ে এই আন্দোলনকে ভেঙ্গে দেওয়ার নানা কাজ করে গেলেও এই লড়াই দমে যায়নি। গত ২৫ জুলাই নির্মাণকার্য জবরদস্তিমূলকভাবে চালু করবার জন্য রাজ্যের কংগ্রেসী সরকার ৫০০ সশস্ত্র পুলিশ সেখানে পাঠায়। সঙ্গে নিয়ে যায় দমকল, অ্যাম্বুলেন্স, স্ট্রেচার প্রভৃতি। রাজ্য সরকারের এই মরিয়া প্রস্তুতি কিন্তু থমকে দাঁড়ায় হাজার হাজার গ্রামবাসীর সমাবেশের সামনে। আর প্রায় পাঁচ শতাধিক মানুষ ওয়ার্কারি (ভক্তি সম্প্রদায়) সম্প্রদায়ের নেতা মহারাজ কাড়াডকার-এর নেতৃত্বে প্রস্তাবিত প্ল্যান্টের নির্মাণ স্থলের দরজা ভেঙ্গে দেয় এবং যে সামান্য কার্য হয়েছে তাও ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়। পুলিশ ২২ জন 'দোষী' গ্রামবাসীকে গ্রেপ্তার করলে গ্রামবাসীরা ও ওয়ার্কারি সম্প্রদায়ের মানুষরা চাকান্ থানায় বিক্ষোভ জানায়। তাঁরা দাবী জানায় যে, ডাও কোম্পানীর প্রস্তাবিত প্রকল্পের নির্মাণকার্য ভেঙে দিয়েছে গ্রামের শতশত মানুষ। অতএব হয় সমস্ত গ্রামবাসীকে জেলে ঢোকাতে হবে আর নয়তো আটক করা ২২ জনকে মুক্তি দিতে হবে। আওয়াজ ওঠে, সন্ত তুকারাম মহারাজ (ভক্তি আন্দোলনের নেতা)-এর পুণ্যস্থল থেকে কুখ্যাত ডাও কোম্পানিকে হঠে যেতে হবে। মহারাষ্ট্র তথা ভারত থেকে ডাও কেমিক্যালসকে হঠিয়ে দেবার দাবি উঠতে থাকে। বিক্ষোভরত মানুষদের মধ্যে থেকে। ব্যাপক চাপের মুখে রাজ্য সরকারকে পিছু হঠতে হয়। আটক ২২ জন গ্রামবাসীকে পুলিশ মুক্তি দেয়। গত ২৯ জুলাই সংঘর্ষ সমিতি ও ওয়ার্কারী সম্প্রদায়ের এক যৌথ সভায় আগামী দিনে ডাও কোম্পানি ও স্পেশাল ইকনমিক জোন বিরোধী সংগ্রামকে আরও জোরদার করার অঙ্গীকার গ্রহণ করা হয়। পরিকল্পনা অনুযায়ী, গত ৯ আগস্ট সন্ত তুকারাম মহারাজ-এর জন্মস্থান দেহু-তে এক বিশাল জমায়েতে প্রায় ৩০ হাজার মানুষ সমাবেশিত হয়। এই সমাবেশে আওয়াজ ওঠে—'ডাও কেমিকাল্স ভারত ছাড়।' এই আন্দোলন এ দেশের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামকে উজ্জিবিত করবে বলেই মনে হয়।

সাম্রাজ্যবাদের কাছে আত্মসমর্পণের নয়া দলিল

ভারত-মার্কিন পরমানু চুক্তি

শমীক চক্রবর্তী

ভারত-মার্কিন পরমানু চুক্তি এখন আপন গতিতে সম্পন্ন হওয়ার দিকে। চুক্তি সই, তারপর সংসদে আস্থা ভোট, এবং ক্রমাণ্বয়ে আন্তর্জাতিক পারমানবিক শক্তি সংস্থা (আই এ ই এ) ও পারমানবিক সরঞ্জাম সরবরাহ গোষ্ঠী (এন এস জি)তে নানা আলাপ-আলোচনার প্রক্রিয়া চলছে—যার স্বাভাবিক পরিণতি হবে বিপজ্জনক, আত্মসমর্পণকারী শর্তসমূহে ভারতের আবদ্ধ হয়ে পড়া। কংগ্রেসের নেতৃত্বে এই চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার দিকে গেলে তথাকথিত ‘বামপন্থী’ দলগুলো সিপিএমের নেতৃত্বে এর বিরোধিতায় নামে, যে বিরোধিতার মধ্যে ভোটের অঙ্ক কষাটাই সার। যে সিপিএম রাজ্য সরকার পরিচালনা করতে গিয়ে পরতে পরতে সাম্রাজ্যবাদী নীতির কাছে আত্মসমর্পণ করে বসে আছে, তাদের এই চুক্তির বিরোধিতা তথা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা নিয়ে জনগণও সন্দিহান। সিপিএম এই চুক্তি প্রসঙ্গে ইউপিএ সরকারের বিরুদ্ধে জনগণের থেকে চুক্তির বক্তব্যকে গোপন রাখার অভিযোগ তুলেছে, অন্যদিকে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের ভয়ংকর রূপ দেখানো সিপিএম, হরিপুরে পরমাণু চুল্লীর প্রস্তাব নিয়ে আসা সিপিএম চুক্তির বিরোধিতা করছে কেন? চুক্তিটা ভালো না খারাপ?—ধোঁয়াশায় ভরা গোটা বিষয়টা। আসুন, কাটাছেঁড়া করা যাক চুক্তির বিষয়বস্তুকে।

১২৩ চুক্তি ও হাইড অ্যাক্ট

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পারমানবিক শক্তি আইন ১৯৫৪-র অন্যান্য দেশের সাথে সমঝোতা বিষয়ক ১২৩ নং ধারা অনুযায়ী আমেরিকা অন্যান্য ঘোষিত-ভাবে পরমানু অস্ত্রবর্জিত রাষ্ট্রগুলোর সাথে, যারা পরমানু অস্ত্র প্রসার রোধ চুক্তি (এন পি টি) ও সামগ্রিক পরমানু পরীক্ষা নিষেধাজ্ঞা চুক্তিতে (সি টি বি টি) সই করেছে, তাদের সাথে পরমাণু শক্তি সংক্রান্ত সমঝোতায় যেতে পারে। ফলে প্রায় ২৫টি দেশের সাথে আমেরিকা এরকম ১২৩ চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। কিন্তু ভারত তো ঐ সিটিবিটি বা এনপিটি কোনটাতেই সই করেনি। তাহলে ভারতের জন্য কি করে প্রযুক্ত হবে ঐ আইন?

অতঃপর হাইড আইন। মার্কিন পার্লামেন্টের সদস্য হেনরি জে হাইডের পেশ করা প্রস্তাবটি আইন আকারে পাশ হয়ে গেল পার্লামেন্টে—তৈরী হল আমেরিকা-ভারত শান্তিপূর্ণ পারমানবিক শক্তি সহায়তা আইন ২০০৬। সাপও মরল, লাঠিও ভাঙলো না। এনপিটি ও সিটিবিটি সই না করা ভারতের সাথে চুক্তি সই করে ফেললো আমেরিকা, হাইড আইনের জোরে। এবং অবাক হয়ে আমরা দেখলাম যে সিটিবিটি ও এনপিটিতে সই না করা অন্য দেশগুলোর ক্ষেত্রে, এমনকি মার্কিনবন্ধু ইজরায়েলের ক্ষেত্রে কিন্তু এরকম কোনও ব্যতিক্রম হল না। যারা চুক্তির পক্ষে, তারা ব্যতিক্রমীভাবে ভারতের এই স্বীকৃতি আদায়কে বড় করে দেখাচ্ছে। তাদের কথায়, এ এক বিরাট অগ্রগতি, দেশের শক্তিসমস্যার নিরিখে। এই চুক্তি অনুযায়ী, দেশের ভিতরে অসামরিক ক্ষেত্রে শক্তি উৎপাদনের জন্য ভারতবর্ষ জ্বালানী ও প্রযুক্তিগত সুবিধা(?) পাবে। এর জন্য ভারতে যেকটা অসামরিক পরমানু চুল্লী আছে, তা আইএইএ-র নজরদারিতে আসবে।

পরমানু জ্বালানী-পরমানু বিদ্যুৎ

প্রথমত, পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদন খুবই ব্যয়সাপেক্ষ, সাবেকী উৎপাদন খরচের ২-৩ গুণ, কারণ পরমাণু চুল্লী স্থাপনের প্রাথমিক খরচটাই বিশাল। পরিমাণটা শুনলে অবাক হবেন, মোটামুটি ১ কিলোওয়াট বিদুৎ পিছু ২৯৫০ মার্কিন ডলার থেকে শুরু করে কখনও কখনও ৫-৬ হাজার মার্কিন ডলার পর্যন্ত। বিজনেস উইক পত্রিকার মতে, “আমেরিকা কিলোওয়াট পিছু ১০০০-২০০০ মার্কিন ডলার খরচে চুল্লী তৈরী করতে চাইছে...”, তাদের কথায়, “যদিও সম্প্রতি যে চুল্লিগুলো সস্তায় করা গেছে, সবই আমেরিকার বাইরে, তাদের খরচ কিলোওয়াট পিছু ২০০০ মার্কিন ডলারের বেশী।” ইউরেনিয়ামের অভাব আছে—এই অজুহাতে চুক্তিটা করতে ভারতের শাসকরা লালায়িত। অথচ ইউরেনিয়ামের দর আন্তর্জাতিক বাজারে অসম্ভব চড়া। পরিশ্রুত পারমানবিক জ্বালানীর ক্ষেত্রেও তাই। এই সব আমদানী কবে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হবে, আর তা শস্তায় দেওয়া হবে? নিশ্চয়ই দানছত্র খুলে বসেনি আন্তর্জাতিক পুঁজির অন্যতম কেষ্টবিষ্টু ঐ পারমানবিক সরঞ্জাম ব্যবসায়ী লবি!

অথচ ভারতে মজুত আছে প্রচুর থোরিয়াম। থোরিয়াম -২৩২ থেকে ঐ প্রয়োজনীয় ইউরেনিয়াম-২৩৩ তৈরী করা যায় বিশেষ পদ্ধতিতে। এটাই ভারতের নিজস্ব পারমানবিক কর্মসূচীর অভিমুখ হিসেবে গৃহীত ছিল। পৃথিবীর মধ্যে ভারতে ফাস্ট ব্রিডার প্রযুক্তির উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটেছে, যার ওপর দাঁড়িয়ে ভারত তার পরমানু গবেষণার দ্বিতীয় পর্যায়ে ঢুকেছে। এরপর প্রস্তুতি চলছিল তৃতীয় পর্যায়ে উন্নীত করার, যেখানে ঐ থোরিয়াম-২৩২ আর তার থেকে উৎপাদিত ইউরেনিয়াম-২৩৩ দিয়ে দেশীয় নিজস্ব প্রযুক্তির সাহায্যে কাজ হবে। তারই প্রস্তুতি চলছিল দেশের বিভিন্ন পরমাণু গবেষণা কেন্দ্রগুলোতে। পরমানু বিদ্যুৎ উৎপাদন খরচসাপেক্ষ এবং বিপজ্জনক হলেও (রাশিয়ার চেরনোবিল বা আমেরিকার থ্রি মাইল আইল্যান্ডের ভয়াবহ দুর্ঘটনা আমরা ভুলিনি) পরমানু গবেষণার কাজ দেশীয় তত্ত্বাবধানে যেভাবে এগিয়ে যেতে পারতো, এই চুক্তির মাধ্যমে তা অনেকাংশেই খর্ব হয়ে যাবে।

শেষতঃ, এত ঢাকঢোল পিটিয়ে যে পরমানু শক্তি উৎপাদনের কথা বলা হচ্ছে, হিসেব বলছে, তা এই মূহুর্তে ভারতের মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ২.৯ শতাংশ, যেখানে তাপবিদ্যুতের মাধ্যমে তৈরী হয় মোট বিদ্যুতের ৬৪.৬ শতাংশ। ২০২০ সালে পারমানবিক বিদ্যুতের লক্ষ্যমাত্রা হিসেবে ভারত সরকারের পারমানবিক শক্তি দপ্তর ঠিক করেছে ২০০০০ মেগাওয়াট, যার মধ্যে দেশের আভ্যন্তরীণ পরিকাঠামোয় তৈরী করা যাবে ১৪,৮৮০ মেগাওয়াট। যদি পারমানবিক সরঞ্জাম সরবরাহ গোষ্ঠী (এনএসজি) ভারতের ক্ষেত্রে তাদের নীতি শিথিল করে, যদি আগের কথামত রাশিয়া থেকে আটটি চুল্লী আসে, যদি কুডানকুলামের দুটি চুল্লী তৈরী হয়, যদি আন্তর্জাতিক পারমানবিক বাজার ভারতের জন্য খুলে যায়, যদি প্রতিশ্রুতি মত বাইরে থেকে ২০০০ মেগাওয়াট পারমানবিক শক্তি পায় জাতীয় তাপবিদ্যুৎ সংস্থা (এনটিপিসি), তবে মোট পারমানবিক শক্তির পরিমাণ দাঁড়াবে দ্বাদশ পরিকল্পনার শেষে ২৫৮৮০ মেগাওয়াট। এবং এই হিসেবটা এত করেও মোট বিদুৎ চাহিদার ৯ শতাংশ। এর চেয়ে ভালো ছিল না কি বিকল্প শক্তির কথা ভাবা? জলবিদ্যুৎ, সৌরশক্তি, বায়ুশক্তি তো ছিলই, নতুন গ্যাসের সন্ধান মিলেছে কৃষ্ণা অববাহিকায়, নতুন জ্বালানীর সন্ধান মিলেছে জ্যাট্রোবা গাছের বীজে...। আজ পৃথিবীর নানা দেশ যখন পরমানু বিদ্যুৎ থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে, আওয়াজ উঠেছে পরমানু চুল্লী নয়, পরমানু বিদুৎ নয়, পরমানু যুদ্ধ নয়—তবু আমাদের দেশে সেই কারবার চালানোর জন্যই তৎপরতা তুঙ্গে। সেই তৎপরতার অংশীদার হয়েই আমাদের রাজ্য সরকারও কোমর বেঁধে নেমেছে কখনও সুন্দরবনে, কখনও বা হরিপুরে পরমানু চুল্লী করবে বলে। এখন আবার তারাই গলা ফাটাচ্ছে পরমানু চুক্তির বিরুদ্ধে। যাই হোক, এসব তো গেল প্রযুক্তির দিকটা। চুক্তির অন্য দিকটা এবার দেখা যাক।

পরাধীনতার দাসখত পরমানু চুক্তি

পরমানু চুক্তিকে ভারতরাষ্ট্রের শাসকশ্রেণীর ক্রমবর্ধমান মার্কিন ঘেষা নীতির ফসল হিসেবেই দেখতে হবে। ভারত-মার্কিন কৌশলগত সহযোগিতার নীতি, যৌথ সেনা মহড়া, চড়া দামে মার্কিন অস্ত্র ব্যবসায়ীদের থেকে অস্ত্র কেনা—ভারতের শাসকশ্রেণীর প্রবণতাটা জলের মত পরিষ্কার। জোট নিরপেক্ষতার নীতি সে ছেড়েছে, মার্কিন পারমানবিক সরঞ্জাম ব্যবসায়ী গোষ্ঠীকে খুশি করেছে এবার, আর তার পুরষ্কার হিসেবে ১২৩ চুক্তির পাশাপাশি বিশেষভাবে পেয়েছে হাইড অ্যাক্ট—শুধু ভারতের জন্য।

হাইড অ্যাক্টের ১০৪ নং ধারার শাখাপ্রশাখায় যা যা বলা আছে সেগুলোয় চোখ বোলানো যাক—

(১) মার্কিন প্রেসিডেন্টকে প্রতি বছর মার্কিন কংগ্রেসে রিপোর্ট পেশ করে স্বীকৃতি দিতে হবে যে ভারতের বৈদেশিক নীতি মার্কিন নীতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হচ্ছে, এবং আরো নির্দিষ্টভাবে বললে ইরানকে বিচ্ছিন্ন করা এবং এমনকি নিষেধাজ্ঞা জারী করার মার্কিনী নীতিকেও ভারত সমর্থন করছে।

(২) মার্কিন সরকারের বিতর্কিত নিরস্ত্রীকরণ নিরাপত্তা উদ্যোগগুলোতে ভারতকে অংশগ্রহণ করতে হবে। এই উদ্যোগগুলোর মধ্যে আছে অন্যের জলসীমানার মধ্যে মার্কিন নৌবহর ঢোকানোর মত অনৈতিক নীতিও।

(৩) যে সমস্ত দ্বিপাক্ষিক/বহুপাক্ষিক চুক্তিতে ভারত এ যাবৎ সই করেনি (যেমন মার্কিন ক্ষেপনাস্ত্র প্রযুক্তি নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা, অস্ট্রেলিয়া গ্রুপ প্রভৃতি) সেসবের সাথে সহমত প্রকাশ করতে হবে।

হাইড অ্যাক্ট মোতাবেক এসব না করলে বা পারমাণবিক বোমা পরীক্ষা করলে, বা এককথায় মার্কিন নীতির সাথে গলা না মিলালে এই ১২৩ চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে ভারত পরমাণু সরঞ্জামের সরবরাহ পাবে না, বিপরীতে কিন্তু আইএইএ-র রক্ষাকবচ বা নজরদারী বাতিল হবে না, তা চিরকালের জন্য লাগু হয়ে গেল।

এই চুক্তির বলে ভারতের আভ্যন্তরীন নিরাপত্তায় ঢুকে পড়ল সাম্রাজ্যবাদের নজরদারী। ভারতের ২২টি পরমাণু চুল্লীর মধ্যে অসামরিক প্রয়োজনে ব্যবহৃত ১৪টি চুল্লী-ই আইএইএ-র নজরদারীর মধ্যে আসবে, ভবিষ্যতে আরও অসামরিক চুল্লী তৈরী হলে তাও এই নজরদারী ভুক্ত হবে।

দীর্ঘদিন ধরে যে ভারতবর্ষ এনপিটি ও সিটিবিটি-তে সই করেনি, এবং জোট নিরপেক্ষতার কথা বলে একটা স্বাতন্ত্র বজায় রেখেছে, আজ এই চুক্তির ফলে কিন্তু কার্যত এনপিটি ও সিটিবিটি-তে সই না করেও ভারতকে চলে আসতে হলো মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পরমাণু সংক্রান্ত নীতির অধীনে।

১২৩চুক্তি সংক্রান্ত ২০০৫-এর যৌথ বিবৃতিতে ‘অসামরিক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ পারমাণবিক সহযোগিতা’-র কথাবলা হয়েছিল। অথচ জ্বালানী সমৃদ্ধকরণ, পুণর্ব্যবহার এবং ভারী জল উৎপাদন প্রযুক্তিতে কোনোরকম সহযোগিতার কথা চুক্তিতে নেই, যদিও এগুলি পরমাণু শক্তি উৎপাদনের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ।

একদিকে ভারতে গবেষণাজাত ফার্স্ট ব্রিডার প্রযুক্তিকে জ্বালানী চক্রের অংশ হিসেবে দেখা হবে এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় যেকোনো প্রযুক্তি দ্বিরাষ্ট্রীয় ব্যবহার্য প্রযুক্তির নিষেধাজ্ঞার অধীনে চলে আসবে, অন্যদিকে চুক্তিভঙ্গ হলে সমস্ত গৃহীত সামগ্রীর জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, এবং সরবরাহ বন্ধ হবে কিনা ব্বাও পুরোপুরি নির্ভর করবে মার্কিন কংগ্রেসের উপর।

মোটের উপর এভাবে ধারা ধরে ধরে আলোচনা করলে দেখা যাবে যে পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদনে কিছু সুবিধা হবে বলে যে চুক্তি হয়েছে তার ছত্রে ছত্রে রচিত হয়েছে পরাধীনতার ফরমান। বহু ধারায় আপাতভাবে সমান সমান শর্তের কথা বলা হলেও একথা স্পষ্ট যে দুটো অসম শক্তির দেশ সমান চুক্তি করলেও তা এক অসম চুক্তিতেই পর্যবসিত হয়। এভাবে বিশ্ববাণিজ্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এধরণের সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির নানা জোটের সাথে ভারতের একাত্ম হওয়ার ফলে আমাদের দেশের অর্থনীতির কি ভয়াবহ রূপ দাঁড়িয়েছে তা আমরা দেখেছি, দেখছি প্রতিদিন। দেশের অর্থনীতিকে সাম্রাজ্যবাদের কাছে বিকিয়ে দেওয়া, দেশের জল-জঙ্গল-জমিকে বিশ্বায়নের হাতে সঁপে দেওয়া, দেশের মেধাসম্পদ-শ্রসম্পদকে বিশ্বপুঁজির শোষণের জন্য ছেড়ে দেওয়ার পর এবার দেশের পারমানবিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তি গবেষণাকে এভাবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ তথা বিশ্বপুঁজির কাছে উন্মুক্ত করে দেওয়ার পরিণতি যে ভয়ংকর তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। ইরাকে গণবিধ্বংসী অস্ত্র খুঁজে না পেলেও সেখানে নজরদারির অছিলায় ভয়াবহ যুদ্ধে মেতে উঠতে কসুর করেনি আমেরিকা। ফলে এই চুক্তির মাধ্যমে ভারতের প্রাণভোমরাকে কৌটোয় পুরে মার্কিন কংগ্রেসের কাছে সঁপে এসেছে মনমোহন সিংরা। চীনের সাথে আমেরিকার ১২৩ চুক্তিতে এমন কথা আছে যে আমেরিকার আভ্যন্তরীণ কোনো আইনের বলে দুই দেশের মধ্যেকার চুক্তি বিঘ্নিত হবে না। ভারতের সাথে ১২৩ চুক্তির বেলায় সেসব নেই। প্রাণভোমরাটা এখানে এমনিই আধমরা, কখন তাকে টিপে মারবে, তা জো হুজুর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ তথা বিশ্বপুঁজির হাতে।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ তথা বিশ্বপুঁজির নীতিমালার কাছে আত্মসমর্পণ করে বসে আছে যে সিপিএম, যারা সুন্দরবন কিংবা হরিপুরে পরমাণু চুল্লী করবে বলে পরের পর প্রস্তাব আনছে তারা কি করে বিরোধিতা করবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের? কেনই বা তারা রুখবে পরমাণু চুক্তি? তাই তো ২০০৬ সাল থেকে শুরু করে এতদূর এগিয়ে গেল চুক্তিটা—বিরোধিতা কোথায় ছিল তখন? গত নভেম্বরেই তো আইএইএ তে আলোচনায় যাওয়ার সবুজ সঙ্কেত কেন্দ্র সরকারকে দিয়ে দিয়েছিল সিপিএম। নন্দীগ্রামের ক্ষত সামলে নিজেদের ‘বাম’ ইমেজকে প্রতিষ্ঠা করার মরীয়া তাগিদেই তাদের হঠাৎ আস্ফালন। এই ভন্ড বিরোধিতাকে চিনুন। গড়ে তুলুন প্রকৃত প্রতিরোধ—পরাধীনতার দাসখত পরমাণু চুক্তির বিরুদ্ধে।

কেন্দ্রের জনবিরোধী নীতির প্রতিবাদে ও শ্রম আইন লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে
২০ শে আগস্ট ধর্মঘট ডেকেছিল সরকারী ‘বামপন্থী’রা।

সিপিএমের সমর্থনে ৪ বছরের ইউপিএ আমলে গৃহীত হয়েছে

● সেজ আইন ২০০৫ ও ● বীজ আইন

-এর মত ভয়াবহ জনবিরোধী নীতিসমূহ

অন্যদিকে **এরাজ্যেই** ২০০৭ সালের মার্চ পর্যন্ত হিসেবে

বিভিন্ন সংস্থা পি এফ বাবদ মোট ২৬২.৫২ কোটি টাকা মেটায়নি।

রাজ্য সরকারী সংস্থাগুলিতে প্রভিডেন্ড ফান্ড বকেয়া ২৫ কোটি টাকা।

বকেয়া প্রভিডেন্ড ফান্ডের ক্ষেত্রে এরাজ্যের স্থান সারা ভারতে দ্বিতীয়।

বিভিন্ন সংস্থা ইএসআই বাবদ বাকি রেখেছে ১৭৩.৭৩ কোটি টাকা।

ই এস আই বকেয়ার নিরিখেও গোটা দেশে রাজ্যের স্থান দ্বিতীয়।

ন্যূনতম মজুরী আইনের আওতায় নিয়ে আসা
৫০টি শিল্প ও পরিষেবার অধিকাংশতেই নির্ধারিত

ন্যূনতম মজুরীর চেয়ে কমে কাজ করতে হয় এরাজ্যের শ্রমিকদের।

স্থায়ী কাজে ঠিকা প্রথায় লোক নিয়োগও বাড়ছে অবাধে।

চিঠিপত্র

ছোট সংসার, সুখি সংসার

আজকের বাস্তব অবস্থাকে শ্রমিকদের বিবেচনা করা প্রয়োজন। শ্রমিক বলতে সমস্ত ধরনের শ্রমিকের কথা বলা হচ্ছে। সেটা সংগঠিত শ্রমিক হোন আর অসংগঠিত শ্রমিক হোন, এই দায়িত্ব ভার নিজেদের কাঁধে তুলে নিতে হবে। বিশেষ করে গ্রুপ সংগঠনের সাথে যুক্ত শ্রমিকদের দায়িত্বটা অন্য শ্রমিকদের থেকে বেশি। তাই গ্রুপ সংগঠনগুলোর আজকের অবস্থা কোথায়, তা বিবেচনা করার কথাটা বলা হচ্ছে। আজ বিশ্বায়নের ধাক্কায় শ্রমিকশ্রেণী সংখ্যাগত দিক দিয়ে আগের চেয়ে অনেক গুণ বড়। বহু মানুষ প্রতিনিয়ত মজুরি দাসে পরিণত হয়ে চলেছে। যেমন জমি থেকে উচ্ছেদ হওয়া গরিব ও ভাগ চাষিদের দল। সংখ্যাগত দিক দিয়ে আজকের ভারতবর্ষের শ্রমিকশ্রেণী অনেক বড়। সংখ্যাটা ৫০ কোটির বেশি দাঁড়িয়ে গেছে বলে আমার ধারণা।

আমরা যাঁরা কম্যুনিস্ট গ্রুপ সংগঠনের সাথে যুক্ত, তাঁরা কিছুটা হলেও চিন্তা-ভাবনার দিক থেকে সচেতন বলে আমার ধারণা। বয়সও কিন্তু কিছুটা হলেও শিক্ষা দেয়। আমার মতন বেশ কিছু শ্রমিক আছেন যাঁরা গ্রুপ সংগঠনের সাথে যুক্ত। সেই গ্রুপগুলো হচ্ছে বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক ও কম্যুনিস্ট গ্রুপ সংগঠন। নেতৃত্বের শীর্ষে এক বা একাধিক কিছু ব্যক্তি নিয়ে এই গ্রুপগুলোর জন্ম হয়েছে। এইগুলোর জন্ম আবার সর্ব ভারতব্যাপী কম্যুনিস্ট পার্টি থেকে ভেঙে ভেঙে। এই গ্রুপগুলোর জন্ম আজ প্রায় ৩৪-৩৫ বছর হতে চলেছে। পার্টি নেই। গ্রুপ সংগঠনগুলো পার্টির মতো কাজ করে চলেছে, কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। গ্রুপ সংগঠনের শীর্ষে নেতৃত্বের মনে কোনো ক্ষোভ নেই—এইভাবে যতো দিন চলে চলুক, করার তো কিছুই নেই। আর সমস্ত গ্রুপগুলো দাবি করে, ‘‘আমরাই একমাত্র সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রবক্তা।’’ ‘আমরা’ থেকে ‘আমি’ হয়ে যায়। গ্রুপ সংগঠনই ভর করে থাকে নেতা থেকে শুরু করে গ্রুপ সংগঠনের মধ্যেকার শ্রমিকদের চিন্তা-ভাবনাতেও। যার ফলে এক গ্রুপের শ্রমিকদের সাথে অন্য গ্রুপের শ্রমিকদের ভ্রাতৃত্বমূলক ভাবনা নেই। এটা গ্রুপ সংগঠন থেকে জন্ম নিয়েছে। শ্রমিকদের মধ্যে যে দূরত্ব বেড়েই চলেছে, তার প্রতি নজর দেবার প্রয়োজনও গ্রুপ সংগঠনের শীর্ষ নেতৃত্ব মনে করে না। আর আমরাও স্বীকার করে নিয়েছি, গ্রুপ সংগঠনগুলো হচ্ছে কম্যুনিস্ট গ্রুপ সংগঠন।

এই সকল গ্রুপ সংগঠনগুলো বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে কম্যুনিস্ট গ্রুপ হয়ে নিজের নিজের গ্রুপ সংগঠনকে সাজানো গোছানোর কাজে ব্যাকুল হয়ে যাচ্ছে। তবুও গ্রুপ সংগঠনগুলোকে আঁকড়ে ধরে আছেন। আমি বা আমরা শ্রমিকরা জানতাম যে, সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন হল বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তির আন্দোলন। সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের ধারার জোরে বিশ্বের মানচিত্রে সমস্ত ধরনের সীমারেখাকে মিটিয়ে দেওয়া হয়েছিল। নতুন মানচিত্র তৈরির দিকে শ্রমিকশ্রেণী পা বাড়িয়েও দিয়েছিল।

যাইহোক, আজকের গ্রুপ সংগঠনের নেতৃত্ব যেমন বোঝেন, সেইভাবেই তো তাঁর গ্রুপ সংগঠনকে বোঝাবেন। তাই আজ এক একটি গ্রুপ সংগঠনের নেতৃত্ব দ্বারা সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন বা ভারতবর্ষে আজকের বাস্তব অবস্থায় সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনকে সমস্ত মানুষজনের কাছে তুলে ধরা যাবে? সে কাজ আমি গ্রুপ সংগঠনে দেখতে পাই না।

কেননা সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের ধারাকে কম্যুনিস্ট পার্টি ছাড়া মূল্যায়ণ ও বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়। প্রথমতঃ, এই সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনটাই হল বিশ্ব সর্বহারার মুক্তির আন্দোলন। আমাদের দেশে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের ধারা হবে এক ধরনের আর অন্য সমস্ত দেশে হবে আলাদা আলাদা রকমের? নাকি সমস্ত দেশেই সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের ধারা একই ভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করবে? তাই আমার কাছে প্রশ্ন হল, গ্রুপ সংগঠনগুলোর আজকের বিশাল শ্রমিকশ্রেণীকে ধারণ করার ক্ষমতা বাস্তবে আছে কি? গ্রুপ সংগঠনের নেতারা এটা স্বীকার করছেন না। অন্য দিকে গ্রুপ সংগঠনের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকা আমাদের মতন শ্রমিকদের ঠাঁই বা আছে কোথায় তাই আছি, থাকতে হবে। জানি না কবে এই গ্রুপ সংগঠন থেকে আমাদের মতন শ্রমিকরা মুক্ত হয়ে সর্ব ভারতব্যাপী পার্টির সদস্য হবে? গ্রুপ সংগঠন বলতেই পারে, কে বলেছিল আমার সাথে আসতে? যাও, যেখানে তোমার ইচ্ছা চলে যাও। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় যাঁরা লিখছেন শ্রমিকরা হতাশ, অসহায় ও বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে, খুব জোড়ালোভাবে বলছেন, গ্রুপ সংগঠনে নেতৃত্ব ও শ্রমিকরাও একই গ্রুপে থাকার সুবাদে সুর একই রকম তো হওয়া উচিত। শ্রমিকদের হতাশাকে কাটিয়ে ওঠাবার জন্য কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া যেমন, (১) শ্রমিকশ্রেণীকে ঐক্যবদ্ধ করা, (২) শ্রমিকদের মধ্যে সমন্বয় গড়ে তোলা, (৩) শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব গড়ে তোলা।

এই কর্মসূচিকে দেখলে মনে হবে এটা গ্রুপ সংগঠনের কর্মসূচি। কিন্তু বাস্তবে এই কর্মসূচি পার্টির কর্মসূচি। এই কাজে সফল হয়ে ওঠা সম্ভব কি? মুখে বলছি গ্রুপ সংগঠন, কাজে করছি পার্টির মতন। এই দুই নৌকায় পা দিয়ে চলতে হয় আজকের গ্রুপ সংগঠনের মধ্যে। জানি না কত দিন এইভাবে চলতে হবে। বলতে বাধ্য হচ্ছি যে শ্রমিকরা হতাশ, অসহায় ও বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে। এই সকল শ্রমিকরা ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সাথে যুক্ত আছে, আবার নেইও। কিন্তু গ্রুপ সংগঠনের মধ্যে শ্রমিকরা হতাশ, অসহায় ও বিচ্ছিন্ন নয় তো? নাকি সেখানেও হতাশ, অসহায় ও বিচ্ছিন্ন আছে? তবে এখানে প্রশ্ন হল, এখানে তো ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের নেতৃত্ব দ্বারা পরিচালিত হয় না। এখানে গ্রুপ সংগঠনের বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন প্রথম। যাঁরা হলেন কম্যুনিস্ট, তাঁরা তাহলে শ্রমিকদের মতন হতাশ, অসহায়, বিচ্ছিন্ন নয় তো? ওনারা বিচ্ছিন্নতা, অসহায়ত্ব ও হতাশাকে কাটিয়ে উঠেছেন, নাকি আসলে গ্রুপ সংগঠনের শীর্ষ নেতৃত্বকেই আজ বিচ্ছিন্নতা, হতাশা ও অসহায়ত্ববোধ সবথেকে বেশি তাড়া করে বেড়াচ্ছে? এটাই হল আজকের গ্রুপ সংগঠনগুলোর বাস্তব অবস্থা।

৩৪-৩৫ বছর গ্রুপ সংগঠনগুলো এখনো পর্যন্ত শ্রমিকশ্রেণীকে ঐক্যবদ্ধ করার কোনো কাজ করে উঠতে পারলো না। তাই শ্রমিকরা হতাশ, অসহায়, বিচ্ছিন্ন বলে যতো দোষ শ্রমিকশ্রেণীর ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। আসলে গ্রুপ সংগঠনের প্রয়োজন ফুরিয়ে গিয়েছে। আর গ্রুপ সংগঠন দিয়ে শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ করা তো দূরে থাক, নিজেরা এতটা বিচ্ছিন্ন যে একজন অন্য জনের ছায়াটাও দেখতে নারাজ। তাই সর্ব প্রথম গ্রুপ সংগঠনগুলোর মধ্যে সমন্বয়ের কাজকে প্রশস্ত করতে হবে। তা না হলে সমাজতান্ত্রিক ভাবনা-চিন্তার চেহারা সর্ব ভারতীয় হয়ে উঠতে পারবে না। শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তির রাস্তা বন্ধ হয়ে থাকবে। তাই গ্রুপ সংগঠনের ঔচিত্য আজ নেই। ভেঙে দিতে হবে গ্রুপ সংগঠনের পরিধি। আরও বড় করতে হবে পরিধিকে। আজকের বিশ্বায়নের আক্রমণে শ্রমিকশ্রেণী থেকে সমাজের সমস্ত খেটে খাওয়া মানুষের বাঁচার রাস্তা শেষ হয়ে যাচ্ছে। এখন আর গ্রুপ নয়। এখন কোটি কোটি শ্রমিক, কৃষক, যুবা, ছাত্র, শিক্ষক এই সকল মানুষের জন্য চাই কম্যুনিস্ট পার্টি। পার্টি ছাড়া সম্ভব নয়। গ্রুপ সংগঠন অচল সিকির মতন হয়ে গিয়েছে। একটু বোঝার চেষ্টা করুন গ্রুপ সংগঠনের শীর্ষে যাঁরা বসে আছেন। এখান থেকে নতুন করে চলতে হবে আমাদের।

এই লেখাটা লেখার জন্য নিজের মানসিকতাকে তৈরি করতে হয়েছে। কেননা আমি আমার নেতৃত্ব সম্বন্ধে লিখছি। একজন শ্রমিকের পক্ষে এত বড় ঝুঁকি নেওয়া ঠিক হয়েছে কিনা জানি না।

রবি নন্দী, কয়লা শিল্পের (বি সি সি এল)-এর অবরসরপ্রাপ্ত শ্রমিক।

সখী, ‘গণতন্ত্র’ কারে কয়, সেকি কেবলই যাতনাময়

১ পৃষ্ঠার শেষাংশ

কোনদিনই নেতৃত্বের দাবিদার হইতে পারে না।’’ মুখ্যমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে তাদের বক্তব্য, ‘‘তিনি জনমতকে শিরোধার্য করিতেছেন। ভাবা দরকার, জনমতের অন্তরালে স্থিতাবস্থাই কি শিরোপরি চড়িবার উপক্রম করিল?’’ অর্থাৎ, ‘জনমত’-এর চাপে মুখ্যমন্ত্রীর পিছু হটাকে আনন্দবাজার মোটেও ভালো চোখে দেখছে না। তাদের বক্তব্য স্পষ্ট জনমতকে অত পাত্তা দেওয়ার কিছু নেই। বঙ্গবাসী যদি নিজের ভাল নিজে না বোঝে, তাহলে মুখ্যমন্ত্রীকেই দায়িত্ব নিয়ে রাজ্যের মানুষের হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে—তা সে সিদ্ধান্ত যতই অপ্রীতিকর হোক না কেন। তাতে যদি দু-দশটা সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম ঘটে তো ঘটুক। কুছ পরোয়া নেহি! নিন্দুকেরা প্রশ্ন তুলতে পারে, তাহলে ‘গণতন্ত্রের’ কি হবে? গণতান্ত্রিক কাঠামোয় সংখ্যাগুরু জনতার মতামত মেনেই তো কাজ হওয়ার কথা। তাহলে? এই প্রশ্নের জবাবে আনন্দবাজার চটে-মটে ‘গণতন্ত্রের’ সংজ্ঞাটাকেই দিয়েছে বদলে! তারা লিখেছে ‘‘প্রশ্ন উঠিবে, গণতন্ত্র সংখ্যাগুরুর মতকে মান্য করিতে বাধ্য। সুতরাং, সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ যদি কোনও প্রস্তাবনার বিরুদ্ধে থাকেন, তাহা হইলে সেই বস্তুটিকে বাতিল করাই বিধেয়। এই যুক্তির ভিতর গণতন্ত্রের গরিমা নিহিত। গণতন্ত্রের বিপদও নিহিত। সংখ্যাগুরুর মানুষ যদি কোনও উচিত মতকে অনুচিত বলিয়া জ্ঞান করেন, তাহা হইলেই যে সেই মতের যাবতীয় সারার্থ পলকে অন্তর্ধান করিবে, এমন ভাবিবার কোনও কারণ নাই।’’ অর্থাৎ, জনগণ যদি কোনও ‘অনুচিত’ মতামত দেয়, তবে মুখ্যমন্ত্রীর কোনও দায় নেই তা মান্য করার! বারাসাত-রায়চকের হাজার হাজার কৃষিজীবী মানুষ তাদের ভিটে-মাটি থেকে চাষের জমি ছাড়তে রাজি না হয়ে যেহেতু ‘অনুচিত’ কাজ করছে, কাজ করছে, কাজেই মুখ্যমন্ত্রীও চাষাভুষো-দের সেই অন্যায় দাবী মেনে নিয়ে ঠিক করলেন না। নিন্দুকেরা হয়তো এরপরেও প্রশ্ন তুলবে, কোন্‌টা উচিত আর কোন্‌টা অনুচিত সেটা কে ঠিক করে দেবে? আনন্দবাজার, বুদ্ধবাবু না রাজ্যের সংখ্যাগুরু মানুষ? গণতন্ত্রে কি বলা আছে? এই প্রশ্নের জবাব-ও আনন্দবাজারের কাছে তৈরি। তাঁদের সাফ জবাব ‘‘স্থিতাবস্থা লোলুপ বঙ্গজনতা কি সত্যই গণতন্ত্রের যোগ্য? বারাসাত-রায়চক সেতু হইবে না, মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণার পরে স্বস্তিপ্রাপ্ত বাঙালি গোপনে এই অস্বস্তিটি লালন করুক। ভবিষ্যতের স্বার্থে। এবং পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থে।’’

সুতরাং সাধু সাবধান। গণশক্তি-ও যে কথা লিখতে সাহস পায়নি, আনন্দবাজার তা বুক বাজিয়ে লিখে দেখিয়ে দিয়েছে। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের মানুষ গণতন্ত্রের যোগ্যই ছিল না। তাই গুলি করে তাদের খুলি উড়িয়ে দিয়ে সরকার ঠিকই করেছিল। বারাসাত-রায়চকেও ঠিক এমনটাই করার দরকার ছিল। ভবিষ্যতের স্বার্থে। এবং পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থে। ধন্য আনন্দবাজার!

<u>সুন্দরবন</u>

বিড়ি শ্রমিকদের মজুরীবৃদ্ধি

নিজস্ব প্রতিনিধি: উত্তর ২৪ পরগণার সুন্দরবনের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ২৫০০০-এরও বেশী বিড়ি শ্রমিক বিড়ি বাঁধার কাজে নিয়োজিত, যার মধ্যে ৭০ শতাংশই মহিলা শ্রমিক। ২০০১ সালে বসিরহাট মহকুমার বিড়ি শ্রমিকদের দুরবস্থা ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে ৭টি ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন মিলিত হয়ে জয়েন্ট অ্যাকশান কমিটি গড়ে তোলে। হাসনাবাদে তার আগে থেকেই গড়ে উঠেছিল দল-মত নির্বিশেষে বিড়ি শ্রমিকদের সংগঠন সমণ্বয় কমিটি, যারাও ঐ জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটিতে সামিল হয়। ২০০৫ সালে জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটির আন্দোলনের ফলে শ্রমিকদের দৈনিক মজুরী ৩৮ টাকা থেকে বেড়ে ৪৫ টাকা হয়। কিন্তু মালিকদের মুনাফা ক্রমবর্ধমান, অথচ শ্রমিকদের পক্ষে দিন গুজরান করা দুষ্কর হয়ে উঠছে। ইতিমধ্যে মালিকরা দু কিস্তিতে প্রতি হাজারে ৮০ টাকা লাভ বাড়িয়েছে। শ্রমিকরা আন্দোলনের পথে পা বাড়ায়। বসিরহাট, হাসনাবাদ ও হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকের বিড়ি শ্রমিকরা ৩০ টাকা মজুরী বৃদ্ধির দাবীতে ফের আন্দোলন শুরু করে। ১লা আগস্টের মধ্যে তিনটি দ্বিপাক্ষিক বৈঠক ভেস্তে যায়। শ্রমিকরা কাজ বন্ধ করে দেয়, কাঁচামাল ও পণ্য সরবরাহও আটকে দেয়। সমস্যার সমাধান না হলে তাঁরা আরও বড় আন্দোলনে যাওয়ার হুমকি দেয়। অবশেষে নিরুপায় মালিকপক্ষ ১৮ই আগস্ট মিটিংয়ে বসে শ্রমিকদের দৈনিক মজুরী ৪৫ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৬০ টাকা করার সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়।

হিন্দুস্তান মোটরসে ২২ জন শ্রমিকনেতা বরখাস্ত

১ পৃষ্ঠার শেষাংশ

এখন মালিক আর সরকার যতই একসাথে আক্রমণের পরিকল্পনা করুন না কেন, শ্রমিকরা লড়াইয়েরপথে চলতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

যে সরকার আজ উঠতে বসতে শিল্পায়নের ঢাক পেটাচ্ছে, তাদের মদতেই এভাবে নেমে আসছে শ্রমিকদের ওপর এই অন্যায়। হিন্দমোটরের অনতিদূরেই সিঙ্গুর। সেখানে জমি নেওয়ার জন্য খুন, ধর্ষণ, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস... কিছুই বাকি রাখেনি সরকার, সেখানে নাকি গাড়ি কারখানা হবে... আর যে গাড়ি কারখানা এই হিন্দমোটরে আছে, তার নমুনা তো আমরা দেখতে পাচ্ছি। কারখানা এলাকার মধ্যেকার শিল্পের জন্য নির্ধারিত জমি সরকার বিশেষ আইন বানিয়ে আবাসন প্রকল্প করার জন্য বিক্রীর অনুমতি দিয়ে দিল। আন্দোলন অবশ্য চলছে সেই জলাজমি ভরাটের বিরুদ্ধেও। গত ২৩ শে আগস্ট উত্তরপাড়া গণভবনে এর বিরুদ্ধে কনভেনশনও অনুষ্ঠিত হয়। অঞ্চলের বিভিন্ন সংগঠন ও ব্যক্তিবর্গের সাথে একত্রিত হয়ে এইপরিবেশ নষ্ট করার পরিকল্পনা এবং ঐ জমিতে সেজ তৈরীর চক্রান্তের বিরুদ্ধে আন্দোলনেও সামিল আছে এসএসকেইউ।

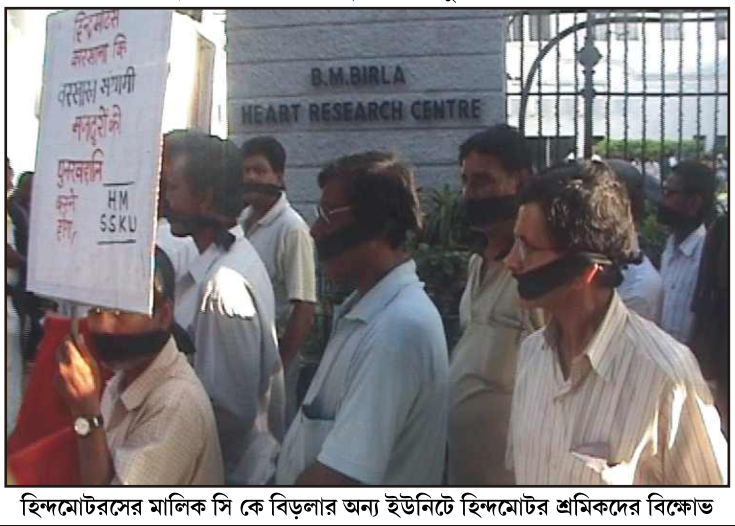

হিন্দমোটরসের মালিক সি কে বিড়লার অন্য ইউনিটে হিন্দমোটর শ্রমিকদের বিক্ষোভ

কিন্তু সরকারের মতলবটা কি? গাড়ি কারখানা? অটোমোবাইল শিল্প? শিল্পায়ন? নাকি মালিকরা যা চাইবে, শুধু তার আজ্ঞাপালন... সিঙ্গুরে টাটা চাইলে চাষীর জমি কেড়ে নিতে হবে, হিন্দমোটরে বিড়লা চাইলে আবার শিল্পের জমি আবাসনের জন্য বেচে দেওয়ার বিশেষ আইনপাশ করিয়ে দিতে হবে। সবই চলছে শিল্পায়নের দোহাই দিয়ে!

পেপসিকো শ্রমিকরা ধর্মঘটে

বিশেষ প্রতিবেদন: পাঞ্জাবের সাংরুরে বহুজাতিক কোম্পানী পেপসিকো ফুডস ইন্ডিয়া লিমিটেডে শ্রমিকরা অনির্দিষ্টকালীন ধর্মঘট শুরু করেছে। মালিকপক্ষের দিক থেকে দীর্ঘ বঞ্চনা ও অত্যাচারের বিরুদ্ধেই এই ধর্মঘট ডাকা হয়েছে।

পেপসিকোতে স্থায়ী শ্রমিকের সংখ্যা ২৮০ এবং কন্ট্র্যাক্ট শ্রমিকের সংখ্যা ৪৫০। এখানে মালিকপক্ষ শ্রমিকদের ইউনিয়ন সংগঠিত করতে দিচ্ছিল না। কখনো নেতৃত্বকে ট্রান্সফার করে, কখনো বা টোপ দিয়ে তারা বারংবার ইউনিয়ন গড়ার প্রচেষ্টাকে বানচাল করে দেয়। স্থায়ী শ্রমিকরা এবার গোপনে সংগঠিত হতে শুরু করলে ম্যানেজমেন্ট খবর পেয়ে অন্যতম নেতা সঞ্জীবকুমারকে মালিকের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তোলার অভিযোগে সাসপেন্ড করে, পরে ২রা আগস্ট তাঁকে বহিষ্কার করে দেয়। আরও চারজন শ্রমিককে তুচ্ছ কারণে সাসপেন্ড করা হয়। ৫ই আগস্ট ইউনিয়ন নথিভুক্ত হয়।

১৯শে আগস্ট থেকে সমস্ত শ্রমিক ধর্ণায় বসে। ২৩ শে আগস্ট সকাল সাড়ে সাতটায় বিশাল পুলিশবাহিনী আসে। এবং হঠাৎই নিকটবর্তী শহর ভবানীগড়ের ট্রাক ইউনিয়নের মালিক ও চালকরা এসে কারখানায় লোডিং করার জন্য ঢুকতে চায়। শ্রমিকরা গেটের সামনে শুয়ে পড়ে। ঐ গুন্ডারা বেধড়কভাবে মারতে থাকে শ্রমিকদের, পুলিশ দাঁড়িয়ে থাকে নীরব দর্শক হয়ে। কিছুক্ষণের মধ্যে গ্রামবসীরা জড়ো হয়ে শ্রমিকদের বাঁচায়, যদিও ততক্ষণে অনেকেই মারাত্মকভাবে জখম হয়েছে। গ্রামবাসীরা ৬ ঘন্টা অবরোধ করে সংলগ্ন হাইওয়ে।

এখনও পর্যন্ত ইউনিয়নের সভাপতিকে ম্যানেজমেন্ট বরখাস্ত করেছে। ২৫শে আগস্ট বিভিন্ন কৃষক সংগঠন পেপসির কৃষকদের সমর্থনে ফ্যাক্টরি গেটে জমায়েত করে। গড়ে ওঠে অ্যাকশন কমিটি। ১লা সেপ্টেম্বর বিশাল মিছিলের প্রস্তুতি নিচ্ছে অ্যাকশান কমিটি।

নেপাল কোন পথে

চন্দন দেবনাথ

গত ১০ এপ্রিল বিভিন্ন দেশ থেকে আসা কয়েক হাজার পর্যবেক্ষকের উপস্থিতিতে প্রায় শান্তিপূর্ণ ভাবেই সম্পন্ন নেপালের সংবিধান সভার নির্বাচনে মাওবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির সর্বোচ্চ ভোট প্রাপ্তিটা অনেককেই মনে হয় বিস্মিত করেছে। বিরোধী পক্ষের দিক থেকে এই সত্যটা হজম করে নিতে এখনও মনে হয় বেশ কষ্টই হচ্ছে। যদিও নব নির্বাচিত সংবিধান সভার প্রথম বৈঠকে প্রায় সর্বসম্মতিক্রমেই রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ ও প্রজাতন্ত্র নির্মাণের পক্ষেই ভোট পড়ে। এবং এ ব্যাপারেও কোনও দ্বিমত থাকার অবকাশ নেই যে, নেপালের এই উল্লেখযোগ্য পট পরিবর্তনের পেছনে আসলে আছে মাওবাদীদের নেতৃত্বে দীর্ঘ গণসংগ্রামেরই একমাত্র অবদান। এ সত্ত্বেও তাদের সরকার গঠনের প্রয়াসকে যতোভাবে পারা যায় বানচাল করার চেষ্টা চালানো হয়েছে। উদ্দেশ্য ছিল এটা সুনিশ্চিত করা যাতে সরকারি ক্ষমতার সমস্তটাই মাওবাদীদের কুক্ষিগত না হয়। অনেক টানাপোড়েনের পর বিরোধী দলগুলোর সেই প্রয়াস অবশেষে সফল হয়েছে।

বিরোধের অন্যতম প্রধান জায়গা ছিল রাষ্ট্রপতির পদ নিয়ে। যদিও চালু অন্তর্বর্তী সংবিধানে এমন কোনও পদের উল্লেখ নেই। কিন্তু নেপালি কংগ্রেস যুক্তি দেয়, রাজতন্ত্র বিলুপ্ত হবার পর নয়া প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শীর্ষে একজন আনুষ্ঠানিক প্রধানের অবশ্যই প্রয়োজন আছে, তা না হলে এ ক্ষেত্রে একটা রাজনৈতিক শূণ্যতা সৃষ্টি হবে। অন্যদিকে সি পি এন (ইউ এম এল)-এর নেতারা সরাসরিভাবেই জানিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁরা চান সংবিধান সভার শীর্ষে সম্পূর্ণ অ-মাওবাদী কোনও একজন ব্যক্তিকে। রাষ্ট্রপতির পদটিকে 'আলঙ্কারিক' বলা হলেও, বলাই বাহুল্য যে, সেই রাষ্ট্রপতির হাতে থাকবে সেনাবাহিনীর লাগাম-সহ আরও বেশ কিছু জরুরি ক্ষমতা। সুতরাং এটা বেশ স্বাভাবিক যে, মাওবাদীরা ভীষণ সচেষ্ট ছিলেন এই ক্ষমতাটা নিজেদের হস্তগত করতে। কিন্তু বিরোধী ঐক্যের চাপে অবশেষে তাঁদের হার মানতে হয়েছে। বেশ কিছুদিন ধরে ঝুলে থাকা এই বিরোধের মীমাংসা ঘটাতে হয়েছে সংবিধান সভায় ভোটাভুটিতে গিয়ে।

গত ১৯ জুলাই সংগঠিত সেই নির্বাচনে মাওবাদী প্রার্থীর বিজয় হাসিল করা সম্ভব হয়নি। অন্যদিকে, বিজয়ী ঘোষিত হবার জন্য প্রয়োজনীয় ২৯৮টি ভোটের বদলে ২৯৪টি ভোট পাওয়াতে নেপালি কংগ্রেসের প্রার্থী রামবরণ যাদবের পক্ষেও অবশ্য বিজয় হাসিল করা সম্ভব হয়নি। যদিও উপ-রাষ্ট্রপতির পদটির দখল নিতে সক্ষম হন মাধেশি জনাধিকার ফোরামের প্রার্থী পরমানন্দ ঝা। ৫৯৪ সদস্যের সংবিধান সভায় ৩১২টি ভোট পেয়ে তিনি জয়যুক্ত হন। ২১ জুলাই দ্বিতীয়বার নেওয়া ভোটাভুটিতে অবশ্য রামবরণ যাদবের জিত হাসিল করতে অসুবিধা হয়নি— মাওবাদী বিরোধী ৩টি দলের বোঝাপড়ার ভিত্তিতেই যেটা সম্ভব হয়েছে। ৩০৮টি ভোট পেয়ে মাওবাদীদের প্রার্থী রামরাজা প্রসাদকে তিনি ২৮ ভোটের ব্যবধানে হারিয়ে দেন। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে তাঁদের এই পরাজয়ের জন্য পার্টি প্রমুখ প্রচণ্ড বিরোধী দলগুলোর "অশুভ আঁতাত"-কেই দায়ি করেন। দলের অন্যতম প্রবীন নেতা বাবুরাম ভট্টরাই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে জানান, তাঁরা ফের বিদ্রোহের কথা ভাবছেন।

২১ জুলাই সকালেই প্রচণ্ড জানিয়েছিলেন, তাঁদের প্রার্থী না জিতলে তাঁরা সরকারে না-ও যোগ দিতে পারেন। বিকেলে ফল ঘোষিত হবার পর পার্টির মুখপাত্র কৃষ্ণ মাহারা জানান, এই মুহূর্তে বলা যাচ্ছে না তাঁদের পরবর্তী কর্মপন্থা কী হবে, তাঁরা সরকারে অংশ নেবেন কি না। ২২ জুলাই প্রচণ্ড আবার জানান, "রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে আমাদের প্রার্থী পরাস্ত হওয়ার পর সরকারে নেতৃত্ব দেবার নৈতিক ভিত্তি আমরা খুইয়েছি।" অর্থাৎ তাঁরা বিরোধী আসনে বসবেন বলেই ইঙ্গিত দেন। কিন্তু দেখা গেল, কিছু দিন বাদেই, ৫ আগস্ট, চার পার্টির এক যৌথ সভায় সিদ্ধান্ত হল, মাওবাদীদের নেতৃত্বেই "জাতীয় ঐক্যমত্যের সরকার" গঠন করা হবে। যদিও দপ্তর বন্টন নিয়ে একটা বিরোধ রয়েই গেল। ঐ সভায় এটাও ঠিক হয় যে, নতুন সরকারের একটা "সাধারণ ন্যূনতম কর্মসূচি" রচনার জন্য চার দলের একটা টাস্কফোর্স গঠন করা হবে। (এর আগে মাওবাদীদের বাদ দিয়ে বাকি তিন পার্টির এক যৌথ সভায় মাওবাদীদের প্রস্তাবিত "সাধারণ ন্যূনতম কর্মসূচি" এবং সরকার গঠনের পূর্বশর্তকে প্রত্যাখ্যান করা হয়।)

উল্লেখযোগ্য যে, ৫ আগস্টের চার দলের যৌথ সভায় বিরোধী তিন দলের এই দাবি মাওবাদী নেতারা মেনে নেন যে, তাঁরা তাঁদের ক্যাডারদের দ্রুত এই নির্দেশ দেবেন যে, গণসংগ্রাম পর্যায়ে যে-সমস্ত সম্পত্তির দখল নেওয়া হয়েছিল, সেগুলো তাঁদের মালিকদেরই যেন ফিরিয়ে দেওয়া হয়। শুধু তাই নয়, তাঁরা তাঁদের আধা-সামরিক বাহিনী ইয়ং কম্যুনিস্ট লীগের ব্যারাকও এবার তুলে দেবেন। স্মরণযোগ্য যে, এই লীগ ছিল রাজতন্ত্র উচ্ছেদের সংগ্রামে অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি।

এদিকে রাষ্ট্রপতির দেওয়া সময়-সীমার মধ্যে মাওবাদীরা ঐক্যবদ্ধ সরকার গঠন করতে না পারাতে রাষ্ট্রপতি নির্দেশ দেন সংবিধান সভায় ভোটাভুটির পথেই প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন করতে, যেভাবে রাষ্ট্রপতির পদ নিয়ে বিরোধের মীমাংসা হয়। নির্বাচনের দিন স্থির হয় ১৫ আগস্ট। এই সুযোগে নেপালি কংগ্রেস প্রমুখ গিরিজাপ্রসাদ কৈরালা প্রধানমন্ত্রীর পদটি হস্তগত করার জন্য ইউ এম এল এবং মাধেশি জনাধিকার ফোরামের সাথে একটা বোঝাপড়ায় আসার জন্য তৎপর হয়ে ওঠেন। কিন্তু এ বারের আঁতাতটা হল অন্য রকমের, যা ১৪ আগস্টেই পরিষ্কার হয়ে যায়। ঐ দিন ইউ এম এল এবং মাধেশি জনাধিকার ফোরামের সাথে মাওবাদী পার্টির এই মর্মে একটা সমঝোতা হয় যে, পরের দিন নির্বাচনে তাঁরা মাওবাদী প্রার্থী প্রচণ্ডকেই জিতিয়ে দেবেন। দেখা গেল সেটাই হল। ৫৭৭টি ভোটের মধ্যে ৪৬৪টি ভোট পেয়ে তিনিই জয়ী হন। বলাই বাহুল্য যে, কোনও রকম লেনদেন ছাড়া এমন সমঝোতা হওয়ার কথা নয়। সমঝোতার জায়গাটা কিছুটা আমরা জানতেও পারি। ঠিক হয়, প্রতিরক্ষা এবং অর্থ মন্ত্রক থাকবে মাওবাদীদের হাতেই, ইউ এম এল পাবে স্বারাষ্ট্র ও বিদেশ মন্ত্রক আর মাধেশি জনাধিকার ফোরাম পাবে তথ্য ও সম্প্রসার তথা জলসম্পদ মন্ত্রক।

আপাতত ঠিক হয়েছে, ২৪ সদস্যের মন্ত্রিসভা গঠিত হবে। তাতে মাওবাদীদের হাতে থাকবে ন'টি মন্ত্রক। ইউ এম এল এবং মাধেশি জনাধিকার ফোরামের হাতে থাকবে যথাক্রমে ছ'টি ও চারটি মন্ত্রক। আর ছোট দলগুলোর জন্য রাখা হয়েছে চারটি মন্ত্রক। নেপালি কংগ্রেস বিরোধী আসনেই বসবে। ১৮ আগস্ট প্রচণ্ড নেপালের প্রথম প্রজাতান্ত্রিক সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন।

এভাবে সরকার গঠনের পর্ব না হয় সাঙ্গ হল। কিন্তু এবারে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল, এই নতুন সরকারের কাছ থেকে ইতিবাচক কতটুকু কী আমরা আশা করতে পারি। নির্মোহ দৃষ্টি নিয়েই সরকারের আগামী গতিপ্রকৃতির উপর আমাদের নজর রাখতে হবে। কোন পথে সরকার চলতে পারে তার কিছুটা হলেও আভাস এখনই আমরা পেতে পারি পার্টির অন্যতম প্রধান নেতা বাবুরাম ভট্টরাইয়ের একটা সাক্ষাৎকার থেকে। সাক্ষাৎকারটি প্রকাশিত হয়েছিল হার্ড নিউজ পত্রিকার জুন ২০০৮ সংখ্যায়। ভট্টরাইকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, নির্বাচনোত্তর পর্বে ইতিবাচক কী তিনি আশা করেন। উত্তর ছিল, "আমূল পরিবর্তন (drastic change)— পরিমাণগত নয়, গুণগত পরিবর্তন।" কৃষক সংগ্রাম চলাকালীন সয়ে কৃষকরা যে জমিগুলোর দখল নিয়ে নিয়েছিল, বিরোধী দলগুলোর দাবি মেনে সেগুলো জমি মালিকদের ফিরিয়ে দেবার কোনও ইচ্ছেই যে তাঁদের নেই, সেই ইঙ্গিত দিয়ে তিনি বলেছিলেন, "বিজ্ঞানসম্মত ভূমি সংস্কার" ঘটানোর জন্য তাঁরা একটা পূর্ণাঙ্গ কমিশন গঠন করবেন এবং সামন্ততন্ত্রের সমস্ত অবশেষ নির্মূল করা হবে। এই ঘোষণাকে নিশ্চয়ই আমরা স্বাগত জানাবো, যদিও আপোষের লক্ষণ ইতিমধ্যেই লক্ষ্য করা গেছে। কিন্তু সংশয় থেকে যাচ্ছে অন্যত্র। কেননা পুঁজিবাদ বিরোধী কোনও কথা ঐ সাক্ষাৎকারে আমরা পাইনি। এ ব্যাপারে কিছু যুক্তিও অবশ্য তিনি হাজির করেছিলেন। মূল কথা ছিল, নেপালে যে পট পরিবর্তন সদ্য ঘটলো, সেটা হল আসলে "একটি সর্বহারা পার্টির নেতৃত্বে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব", যেখানে আমূল ভূমি সংস্কারই হবে প্রাথমিক কাজ। পাঠকের সুবিধার জন্য প্রাসঙ্গিক জায়গাটা বরং উদ্ধৃতই করা যাক "নেপাল হল আধা-সামন্ততান্ত্রিক, আধা-ঔপনিবেশিক চরিত্র সম্পন্ন মূলত একটি কৃষি ভিত্তিক অর্থনীতি। আমাদের প্রগতিশীল সংস্কার শুরু করতে হবে, শিল্প পুঁজিবাদী সম্পর্কের ভিত্তি তৈরি করতে হবে।" অর্থাৎ ভূমি সংস্কারের লক্ষ্য হবে নেপালে পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটানো। পুঁজির শোষণ থেকে মুক্তি যাঁদের আকাঙ্ক্ষা, তাদের কানে কথাগুলো নিশ্চয়ই মধুর লাগবে না। কিন্তু ভট্টরাই এ ব্যাপারে কিছু যুক্তিও পেশ করেছেন। তাঁর কথা হল, লেনিন এবং মাওয়ের সময়ের তুলনায় পরিস্থিতি এখন অনেক আলাদা। সমাজতন্ত্র নির্মাণের যে পরিস্থিতি তখন ছিল, এখন সেটা নেই। বিশেষত নেপালে তো নয়ই। "এটা একটা জাতীয় বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব। ঠিক ওরকমভাবে ইতিহাসের এক পর্যায় থেকে আর এক পর্যায়ে উল্লম্ফন ঘটাতে আমরা পারি না। সামন্ততন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উল্লম্ফন ঘটাতে আমরা পারি না।"

তাহলে কেমন হবে নয়া প্রজাতান্ত্রিক নেপালের অর্থনীতির চরিত্র? ভট্টরাই এব্যাপারেও স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন "আমরা চাই পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ। এই উদ্যোগে রাষ্ট্রই নেতৃত্ব দেবে। উদাহরণস্বরূপ, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য থাকবে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের অধীনে। অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত উদ্যোগ থাকতে পারে। আমরা বিদেশি প্রত্যক্ষ বিনিয়োগকে কদর করব (appreciate) এবং তা গ্রহণ করব। আমাদের উৎপাদনশীলতা বাড়াতে হবে, পরিকাঠামো বানাতে হবে নেপালের অর্থনৈতিক ভিত্তি খুবই দুর্বল। ...পরিকাঠামোয় বিনিয়োগকে আমরা আমন্ত্রণ জানাবো, বিদেশি প্রত্যক্ষ বিনিয়োগকেও। ক্ষুদ্র এবং মাঝারি প্রকল্পের ফিনান্স আমরা নিজেরাই করতে পারি। কিন্তু বড় প্রকল্পের জন্য আমাদের বিনিয়োগ দরকার।"

নেপালের শিল্পায়ন ঘটাতে মার্কিন প্রশাসনের সাথেও কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে যে তাঁরা আগ্রহী, সেই আভাসও ভট্টরাই দিয়ে রেখেছেন। এবং তিনি এই আশাও ব্যক্ত করেন যে, যে 'সন্ত্রাসবাদী' ছাপ্পা বুশ প্রশাসন তাঁদের উপর মেরে দিয়েছিল, সেই অবস্থান থেকে তারা সরে আসবে।

প্রশ্ন হল, এইসব কথা থেকে আমরা কী বুঝবো। মনকে কি এই বলে সান্ত্বনা দেবো, এ ছাড়া এখন আর কীই বা করার আছে? সত্যিই তো, লেনিন বা মাওয়ের মতো সময়টা তো এখন নেই! 'সমাজতন্ত্র', 'সমাজতন্ত্র' বলে হা-হুতাশ করে তো লাভ নেই! বাস্তবটাকে মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় কী? কিন্তু এই বাস্তবতার যুক্তিটাই যে অবশেষে পুঁজির সেবায়, এমনকী পুঁজির বন্দনায় অবধি পর্যবসিত হতে পারে, সেই অভিজ্ঞতাও তো আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে, শিল্পায়নের নামে শ্রমের উপর পুঁজির আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করাটা কোনও কম্যুনিস্ট সরকারের কাজ হতে পারে না। এক্ষেত্রে তাহলে কী সতর্কতা অবলম্বন করা হবে, সেটাও তো সুস্পষ্টভাবে বলা দরকার। তেমন কিছু কিন্তু আমরা জানতে পারলাম না। কিছুটা অপ্রত্যক্ষভাবে অবশ্য লাতিন আমেরিকার 'ইতিবাচক' পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু সেই পরীক্ষা-নিরীক্ষাও কি শ্রমের উপর পুঁজির আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পথকে রুদ্ধ করে রাখতে পারছে? এখন সমাজতন্ত্র কায়েমের বাস্তবতা যতোই অনুপস্থিত থাক না কেন, এই প্রশ্ন তো আমরা এড়িয়ে যেতে পারবো না, কম্যুনিস্ট পার্টি পরিচালিত একটি সরকার পুঁজির স্বার্থ দ্বারা চালিত হবে নাকি শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণীস্বার্থ দ্বারা। বস্তুত, দ্রুত শিল্পায়ন ঘটাতে কী পরিমাণ লগ্নি টানা গেল, তার বদলে এই প্রশ্নটাই বরং কম্যুনিস্টদের চেতনাকে অনেক বেশি আলোড়িত করা উচিত। আর তার জন্য যেটা সবথেকে বেশি দরকার তা হল, সুস্পষ্টভাবে সুবিধাবাদে অধঃপতিত কম্যুনিস্ট নামধারী পার্টিগুলোকে বাদ দিয়ে বিশ্বের অন্যান্য কম্যুনিস্ট বিপ্লবী সংগঠনগুলোর সাথে নিবিড় মতাদর্শগত আলাপ-আলোচনায় সামিল হওয়া। সবটাই নেপালের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার, এই কথা বলে কিংবা ভট্টরাই যেমন বলেছেন, "নেপালে আমাদের প্রয়োজনে যথোপযুক্ত কোনটা, সেটা বেছে নেবার স্বাধীনতা আমাদের আছে", এমন কথা বলে এই গুরু দায়িত্বটা এড়িয়ে চলাটা মোটেই সমীচীন হবে না। অন্য দিকে বিশ্বের অন্যান্য কম্যুনিস্ট বিপ্লবীদেরও কর্তব্য, গঠনমূলক আলোচনা, সমালোচনা ও পরামর্শ দিয়ে নেপালের কমরেডদের সাহায্য করা। সবারই মনে রাখা দরকার, কম্যুনিস্টরা আন্তর্জাতিকতাবাদী, মতাদর্শের প্রশ্নে জাতীয় বিচ্ছিন্নতা তারা অনুমোদন করে না। মতাদর্শ জলাঞ্জলি দিয়ে সরকারে আসীন থাকার চাইতে মতাদর্শ রক্ষায় সরকার জলাঞ্জলি দিতেও তাদের প্রস্তুত থাকা উচিত।

ভট্টরাইকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, এই বিশ্বায়নের যুগে মার্কসবাদ কতটা প্রাসঙ্গিক। জবাব ছিল "বিশ্বটাকে পরিবর্তন করার আর কোনও বিকল্প দর্শন বা মতাদর্শ আমি দেখছি না। ...সমাজতন্ত্র আর বর্বরতার মধ্যে কোনও একটাকে আমাদের বেছে নিতে হবে।" কিন্তু প্রশ্ন থেকেই যায়, এ রকম কথায় শুধু মার্কসবাদী মতাদর্শের প্রতি সত্যিই কোনও দায়বদ্ধতা প্রকাশ পায় কি না। সুতরাং কোনও সন্দেহ নেই যে, নেপালের মাওবাদীদের সামনে এখন বিরাট চ্যালঞ্জে মতাদর্শে অবিচল থেকে সরকার পরিচালনার চ্যালেঞ্জ। সরকার গঠনের তাড়নায় আপোষের রাস্তা ধরতে যেমন তাঁরা দ্বিধা করলেন না, সেই আপোষকামিতাই অবশেষে তাঁদের পেয়ে বসবে কিনা, কম্যুনিস্টদের কাছে সরকার যে আসলে শ্রেণী সংগ্রামেরই একটা হাতিয়ার, এই ধারণাকে বদলে দিয়ে অবশেষে সংসদ সর্বস্বতাই তাঁদের আচ্ছন্ন করে রাখবে কি না, এই আশঙ্কা থেকেই যায়। বস্তুত, "জাতীয় ঐক্যমত্যের সরকার" কথাটার মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী স্বার্থগুলোর একটা সমন্বয় ঘটানোর প্রয়াস কি লক্ষণীয় নয়? কম্যুনিস্টরা যা কিছু করে, শ্রেণী সংগ্রামের বিকাশ ঘটানোর জন্যই করে, শ্রেণী সমঝোতা প্রতিষ্ঠার জন্য নিশ্চয়ই করে না। অথচ "সাধারণ ন্যূনতম কর্মসূচি" কিন্তু শ্রেণী সমঝোতারই এক ধরনের মূর্ত প্রকাশ ছাড়া অন্য কিছু হওয়া সম্ভব নয়। এরকম হাজার আশঙ্কা নিয়েই আমরা সাগ্রহে নজর রাখবো নেপালের আগামী ঘটনা ধারার প্রতি।

সত্ত্বাধিকারী অমিতাভ ভট্টাচার্য কর্তৃক ১১, রাজা রামমোহন রায় সরণী, কলকাতা-৯ থেকে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক বেঙ্গল লোকমত প্রিন্টার্স প্রাঃ লিঃ, ১০বি ক্রিক লেন, কলকাতা-১৪ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদক : অমৃত পৈড়া**